حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

১২ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. এর বিভিন্ন কিতাব ও বয়ান থেকে সংগ্রহ করে সাজানো

কিতাবের কোন প্রকার অসঙ্গতী বা ভুলের কারণে হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা. দায়ী নন। এর সকল দায়-দায়িত্ব আমরা যারা সংগ্রহ করেছি তাদের। সুতরাং আপনাদের নজরে কোন প্রকার ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে জানিয়ে উপকার করার অনুরোধ রইলো।

www.darsemansoor.com

GET IT ON Google Play

www.islamijindegi.com

Download From App Store

ইসলামী যিন্দেগী (Islami Jindegi) App টি

Google Play Store এবং iPhone এর App Store থেকে ডাইনলোড করে, হযরতওয়ালা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর বয়ান ও সমস্ত কিতাব, প্রবন্ধ, মালফুযাত সংগ্রহ করুন।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
বর্ষবরণ	৭
মুহাররাম মাসে করণীয় ও বর্জনীয়	৯
আশুরাঃ তাৎপর্য, ফযীলত, করণীয় ও বর্জনীয়	১০
সফর মাসে করণীয় ও বর্জনীয়	১৮
আখেরী চাহার শোমবাহ	১৯
আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়	২০
রবিউল আউয়াল মাসে করণীয় বর্জনীয়	২৪
মীলাদের শর'ঈ বিধান	২৬
নবীজী ﷺ এর জন্ম ও মৃত্যুর বিশুদ্ধ তারিখ	২৭
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নবীজী ﷺ এর জন্ম তারিখ	৩০
রবিউস সানী মাসের করণীয় বর্জনীয়	৪৬-৬৫
ফাতিহা ইয়াযদাহম	৫৩
জুমাদাল উলা মাসের করণীয় বর্জনীয়	৪৬
তাওহীদ-রিসালাতের হাকীকত ও তাৎপর্য	৫৬
জুমাদাল উখরা মাসের করণীয় বর্জনীয়	৫৬
দৈনন্দিন আমল	৫৮
রজব মাসের করণীয় বর্জনীয়	৬১
শরী'আতের দৃষ্টিতে শবে মি'রাজ	৬৬-১২২
শা'বান মাসের করণীয় বর্জনীয়	৬৯
শরী'আতের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারা'আত	৬৯
রমযান মাসের করণীয় বর্জনীয়	৭১
রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল	৭২
তারাবীহ নামায	৮০
তারাবীহ পড়ার জন্য হাফেয সাহেব নেয়ার শর্তাবলী	৯৭
তারাবীহ এর বিনিময় গ্রহণের শরয়ী বিধান	৯৯
শরী'আতের দৃষ্টিতে শবে ক্বদর	১০৩
যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল	১০৫
ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার শর'ই নীতিমালা	১১১
শাউয়াল মাসের করণীয় বর্জনীয়	১১৬
প্রথম আমলঃ ঈদ পালন করা	১২১
দ্বিতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসের রোযা	১২৩
তৃতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসে বিবাহ করা	১২৬

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

চতুর্থ আমলঃ শাউয়াল মাসে হাজ্জের প্রস্তুতি	১৩২
পঞ্চম আমলঃ শাউয়াল মাসে বড় আলেম হওয়ার প্রস্তুতি	১৩৪
শাউয়াল মাসের শিক্ষাঃ সুহবাত	১৩৯
যিলক্বদ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়	১৪৭
হজ্জ এবং কুরবানীর ঘটনা	১৫৫
হাজ্জ এর আহকামসমূহ	১৫৮
যিলহজ্জ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়	১৬০
যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফযীলত	১৬৬
কুরবানীর করা	১৭০
ঈদের সুন্নাতসমূহ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল	১৭৪
নিজের আমলের হিসাব নেয়া	১৭৯

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্ব জগতকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবাদত করা। এই ইবাদত তথা সহীহ ঈমান ও নেক আমলের মধ্যেই মানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। আর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতিতে বেইজ্জতি, ধ্বংস ও জাহান্নাম অনিবার্য। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় ও কুদরতের বর্ণনা দিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রভুত্বের স্বীকারোক্তিমূলক অঙ্গীকার নেয়ার পর দুনিয়াতে তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী, রাসূল ও পয়গাম্বর আ.। সকল পয়গাম্বরের মৌলিক শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর প্রতি ও হাশর-নাশরের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল ইত্যাদি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন।

ঈমান ও আমল উভয়টা মানুষের ইখতিয়ারভূক্ত বিষয়। সুতরাং, মেহনত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে উক্ত মহামূল্যবান দু'টি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা এবং তা খুব মজবুত ও দৃঢ় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য।

বিনীত
মনসূরুল হক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

باسمه تعالي

বর্ষবরণ

আল্লাহর দরবারে মাসের যে হিসাব গ্রহনযোগ্য, যে হিসাব আল্লাহ আসমান-জমীন তৈরী করার আগেই করেছেন আর তা হলো এই চন্দ্র মাসের হিসাব। প্রথমে আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন বড় বড় কিছু মাখলুক সৃষ্টি করলেন ছয় দিনে। কুরআনে যে “সিত্তাতে আইয়্যাম” বলা হয়েছে তা হলো আখেরাতের ছয় দিন। ঐ ছয় দিনে চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর আগে চাঁদ-সূর্য কিছুই সৃষ্টি হয় নি। তাই বুঝা যায় যে আল্লাহ কুরআনে যে ছয় দিনের কথা উল্লেখ করেছেন তা আখেরাতের ছয় দিন। অর্থাৎ এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। এরপর আবার সাত দিনে মৌলিক সৃষ্টির মধ্যে আরো কিছু বিস্তারিত মাখলুক সৃষ্টি করলেন। মুসলিম শরীফে তা উল্লেখ আছে। পরবর্তী সাতদিনে চাঁদ-সূর্য মজুদ। তাই এই সাতদিন মানে দুনিয়ার সাত দিন। আর সপ্তম দিনে পুরা আদম জাতির পিতা হযরত আদমকে আ. সৃষ্টি করলেন। এই সাত দিনের হিসাব থেকে চান্দ্র মাসের হিসাব শুরু হয়েছে। এবং এই সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মাসের গণনা বারোটা।

এই বারো মাস। বলতে চান্দ্র মাসের কথা বলা হয়েছে। তাই চান্দ্র মাসের হিসাব রাখা ফরজে কিফায়া। সৌর বছরের কথা বলা হয়নি। সৌর বছরতো দুনিয়া যতদিন আছে ততোদিন। মু‘মিন তার সকল কাজ চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী করে। ইসলাম ধর্ম যে সত্য ধর্ম এবং লেটেষ্ট ধর্ম এই মাসও তার একটা দলিল। সৌর বছর (অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে বছর) মৃত কেননা এর কোন পরিবর্তন হয় না। সারা জীবন একই থাকবে। কিন্তু চান্দ্র বছর জীবিত। নরা-চরা করে। কখনো ২৯ দিনে মাস আবার কখনো ৩০ দিনে। আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না কত দিনে মাস হবে। এমনকি এই চান্দ্র মাসের হিসেবেই মু‘মিন তার সমস্ত ইবাদত করে থাকে। আশুরা, শবে-বারা‘আত, শবে-ক্বদর, ঈদ, হজ্জ, কুরবানী সবকিছুই চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী হয়। আরাফাতো সারা বছর পরে আছে কিন্তু এর বিশেষ কোন ফজিলত নাই। যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ এর মূল্য বেড়ে যায়। এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষভাবে সম্মানী করা হয়েছে। যেগুলোকে ‘আশুরে হুরুম’ বলা হয়। মাস চারটি হলোঃ মুহাররাম, যিলক্বদ, যিলহাজ্জ এবং রজব। এই চার মাসে আরবরা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো না। এমনকি নিজের পিতার খুনিকেও যদি সামনে পেতো তবুও আক্রমন করতো না বা প্রতিশোধ নিতো না।

আরবী বছর বা চান্দ্র বছরের আরো একটি বড় ফজিলত হলো আল্লাহর মেহেরবানীতে আরবী বছর নিয়ে কেউ নষ্টামি করেনি। ইনশাআল্লাহ কখনো হবেও না। আল্লাহ হেফাজত করেছেন। শরী'আতে বর্ষবরণ বলে কোন আমল নেই। বরং এটা গুনাহ, হারাম। অথচ বাংলা বছর বা ইংরেজী বর্ষবরণ নিয়ে অনেক নষ্টামি হয়ে থাকে। জরীপে এসেছে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী মদপান করে থাকে ইংরেজী বছরের শুরুর দিনে। বর্ষবরণ করে, মানুষ হয়ে বাঘ, হরিণের মুখোষ পরে জানোয়ারের রূপ ধারন করে।

তবে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে মুসলমানের বা ইসলামের শত্রু সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। ইসলামকে ধ্বংস করাই তাদের একমাত্র কাজ। আর এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তারা মুসলমানের নাম, লেবাস আকৃতি ধারনকরে করে থাকে। সত্যিকার অর্থে এরা ইয়াহুদ-নাসারাদেরই এজেন্ট। ইয়াহুদ-নাসারাদের টাকায় লালিত-পালিত হচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি আরবী বছরের বর্ষবরনের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-মাহফিল, কুরআন তিলাওয়াতের মজমা বা অন্য কোন ইবাদত করে তবে তা গুনাহের কাজ হিসেবেই গন্য হবে। হুজুর ﷺ নবুওয়্যাত পাওয়ার পর দীর্ঘ তেইশ বছর দুনিয়াতে ছিলেন কিন্তু কখনো বর্ষবরন উপলক্ষে কোন আমল বা কোন বিশেষ মজমা করেন নি, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তেকালের পর সাহাবা রা. একশ বছর দুনিয়াতে ছিলেন কিন্তু তাঁরাও কখনো বর্ষবরন উপলক্ষে কোন আমল বা কোন বিশেষ মজমা করেন নি। কুরআন হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমান নেই। সুতরাং আমরা এই কাজ থেকে বেঁচে থাকবো এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে যে সকল কাজ আমাদের করতে বলা হয়েছে তা করবো এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকবো। পূর্বেই বলা হয়েছে চান্দ্র মাসের হিসেব করেই মুমিন তার আমল সম্পন্ন করে তাই বিভিন্ন মাসের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়ের ইলম থাকা আমাদের জন্য খুবই জরুরী একটি বিষয়। নিম্মে বিভিন্ন মাসের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুহাররাম মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

“মুহাররামুল হারাম” বলা হয়েছে আরবী বছরের বা হিজরী সালের প্রথম মাসকে। অর্থাৎ সম্মানিত মুহাররাম মাস। আল্লাহ যে চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন তার মধ্যে মুহাররাম মাস রয়েছে। আগের উম্মতের জন্য সবচেয়ে সম্মানি রোজা ছিল এই মাসের রোজা। একে আশুরার রোজা বলে। ফরজ রোজার পরে তাদের নিকট সবচেয়ে দামী ছিলো আশুরার রোজা। আর আমাদের জন্য ফরজ রোজার পরে নফল রোজার মধ্যে সবচেয়ে দামী হলো আরাফার রোজা (যিলহাজ্জ মাসের ৯ম তারিখ)। আশুরার রোজা রাখার কারনে পেছনের যিন্দেগীর এক বছরের গুনাহ মাফ হয়। ইয়াহুদিরা বলে আশুরার রোজা মুসা আ. এর যুগ থেকে, আসলে তা না। আর মুসলমান নামধারী শি‘আ যারা সত্যিকার অর্থে কাফের তারা বলে বেড়ায় আশুরা সম্মানী ইমাম হুসাইন রা. এর সময় থেকে। এই শি‘আদের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের সমাজের সরলমনা ইলমবিহীন সাধারণ মুসলমান তাই বিশ্বাস করে বসে আছে। তাদের ধারনা এই দিনে ইমাম হুসাইন রা.শহীদ হয়েছে তাই এই দিনের এতো মর্তবা। অথচ আশুরার ফজিলত শুরু হয়েছে আদম আ. এর যুগ থেকে। আগেই বলা হয়েছে আগের উম্মতের জন্য এই দিনে রোজা রাখা নফলের দিক দিয়ে অনেক দামী। এবং আমাদের নবী ﷺ এই মাসের মর্তবার ব্যপারে ইমাম হুসাইন রা. এর শহীদ হওয়ার আগেই বলে গেছেন। সুতরাং যদি এভাবে বলা হয় যে এই দিনটি আগে থেকেই দামী আর আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন, শহীদের সর্দার ইমাম হুসাইন রা. এর মর্জাদা আরো বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাঁর শহীদের জন্য এই দিনকে পছন্দ করেছেন। এতে একদিকে যেমন সঠিক কথা বলা হলো এবং অপরদিকে ইমাম হুসাইন রা. সন্মানকে মানুষের নজরে আরো উচুঁ করে তুলে ধরা হলো। যেমনঃ আমাদের সকলেরই মৃত্যু আসবে। আল্লাহ যদি কোন মোমিনের মৃত্যু শুক্রবারে নির্ধারণ করে এর দ্বারা ঐ মোমিনের মর্তবা বাড়বে,শুক্রবারের না। ঠিক তেমনি যদি সোমবারে মৃত্যুবরণ করে তবে আরো দাম বাড়লো। শুক্রবার থেকে সোমবারে মৃত্যু মোমিনের জন্য বেশী বরকতময়। যাই হোক এই মাসে কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল আছে তার বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আশুরাঃ তাৎপর্য, ফযীলত, করণীয় ও বর্জনীয়

তাৎপর্যঃ

আশুরা মুহাররম মাসের ১০ তারিখকে বলা হয়। ইসলাম ধর্মে এই দিবসটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এই দিনে ইসলামের অনেক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে।

যেমনঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, (একদা) নবী কারীম ﷺ ইয়াহুদীদের কতিপয় এমন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা আশুরার দিনে রোযা রেখেছিল। নবী কারীম ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন "এটা কিসের রোযা?" উত্তরে তারা বলল, "এই দিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে ফিরআউনের নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিলেন।) এবং ফিরআউনকে দল-বল সহ নিমজ্জিত করেছিলেন। আর এই দিনেই হযরত নূহ আ.- এর কিশতী জূদী পর্বতে স্থির হয়েছিল। ফলে এই দিনে হযরত নূহ আ. ও হযরত মূসা আ. কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরাও এই দিনে রোযা রাখি।" তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "মূসা আ.-এর অনুসরণের ব্যাপারে এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হক্বদার।" অতঃপর তিনি ﷺ সেদিন (আশুরার দিন) রোযা রাখেন এবং সাহাবাদেরকেও রোযা রাখতে আদেশ করেন। (বুখারীঃ হাঃ নং ২০০৪, মুসলিমঃ হাঃ নং ১১৩০, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং-৩৬০)

ফযীলত

১. হযরত আবূ কাতাদাহ রাযি.থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "আমি আশাবাদী যে, আশুরার দিনের রোযার উসীলায় আল্লাহ তা'আলা অতীতের এক বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (তিরমিযীঃ হাঃনং ৭৫১)

২. হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "রমযানের রোযার পর মুহাররম মাসের রোযা সর্বোত্তম।" (মুসলিমঃ হাঃ নং ১১৬৩)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করণীয়

১. আশুরার দিনে রোযা রাখা। তবে এর সাথে ৯ তারিখ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে রাখা। কারণ নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখ। তবে এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করতঃ তোমরা আশুরার পূর্বে অথবা পরের একদিন সহ রোযা রাখবে।" (মুসনাদে আহমাদ-হাঃ নং ২৪১)

২. এই দিন বেশী বেশী তাওবা-ইস্তিগফার করা। কারণ নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, মুহাররম হলো আল্লাহ তা'আলার (নিকট একটি মর্যাদাবান) মাস। এই মাসে এমন একটি দিন আছে, যাতে তিনি অতীতে একটি সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অপরাপর সম্প্রদায়কে ক্ষমা করবেন। (তিরমিযীঃ নং ৭৪১)

৩. দীনের খাতিরে এই দিনে হযরত হুসাইন রাযি. যে ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছেন তা থেকে সকল মুসলমানের দীনের জন্য যে কোন ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করার শিক্ষা গ্রহণ করা।

বর্জনীয়ঃ

১. তা'যিয়া বানানো অর্থাৎ, হযরত হুসাইন রাযি. এর নকল কবর বানানো। এটা বস্তুত এক ধরণের ফাসেকী শিরকী কাজ। কারণ মূর্খ লোকেরা 'হযরত হুসাইন রাযি. এতে সমাসীন হন' এই বিশ্বাসে এর পাদদেশে নযর-নিয়ায পেশ করে, এর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, এর দিকে পিঠ প্রদর্শন করাকে বেয়াদবী মনে করে, তা'যিয়ার দর্শনকে 'যিয়ারত' বলে আখ্যা দেয় এবং এতে নানা রকমের পতাকা ও ব্যানার টাঙ্গিয়ে মিছিল করে; যা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। এছাড়াও আরো বহুবিধ কুপ্রথা ও গর্হিত কাজের সমষ্টি হচ্ছে এ তা'যিয়া। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪,৩৩৫, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৩২, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৩)

স্মর্তব্য: তা'যিয়ার সামনে যে সমস্ত নযর-নিয়ায পেশ করা হয় তা গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয় বিধায় তা খাওয়া হারাম। (সূরা মাইদাহঃ ৩)

২. মর্সিয়া বা শোকগাঁথা পাঠ করা, এর জন্য মজলিস করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা সবই নাজায়িয। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৩২, ৪২)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. ‘হায় হুসেন’, ‘হায় আলী’ ইত্যাদি বলে বলে বিলাপ ও মাতম করা এবং ছুরি মেরে নিজের বুক ও পিঠ থেকে রক্ত বের করা। এগুলো করনেওয়ালা, দর্শক ও শ্রোতা উভয়ের প্রতি নবী কারীম ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (আবূ দাউদ, হাঃ নং ৩১২, ইবনে মাজাহঃ হাঃ নং ১৫৮৪)

৪. কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদতবরণ করেছেন তাই তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দিনে লোকদেরকে পানি ও শরবত পান করানো। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৮৯, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৪০)

৫. হযরত হুসাইন রাযি. ও তাঁর স্বজনদের উদ্দেশ্যে ঈছালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ করে এই দিনে খিচুড়ি পাকিয়ে তা আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনকে খাওয়ানো ও বিলানো। একে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ যেহেতু নানাবিধ কু-প্রথায় জড়িয়ে পড়েছে তাই তাও নিষিদ্ধ ও না-জায়িয। (কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৪০)

৬. হযরত হুসাইন রাযি.-এর নামে ছোট বাচ্চাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে ভিক্ষা করানো। এটা করিয়ে মনে করা যে, ঐ বাচ্চা দীর্ঘায়ু হবে। এটাও মুহাররম বিষয়ক কু-প্রথা ও বিদ‘আত। (ইসলাহুর রুসূম)

৭. তা’যিয়ার সাথে ঢাক-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো। (সূরা লুকমানঃ৬)

৮. আশুরার দিনে শোক পালন করা; চাই তা যে কোন সূরতেই হোক। কারণ শরী‘আত শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন আর বিধবা গর্ভবতীর জন্য সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ৩ দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছে। এই সময়ের পর শোক পালন করা জায়িয নেই। আর উল্লেখিত শোক পালন এগুলোর কোনটার মধ্যে পড়ে না। (বুখারীঃ হাঃ নং ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৪)

উল্লেখ্য যে শরী‘আত কর্তৃক অনুমোদিত শোক পালনের অর্থ হলো শুধুমাত্র সাজ সজ্জা বর্জন করা। শোক পালনের নাম যাচ্ছেতাই করার অনুমতি শরী‘আতে নেই। (দুররে মুখতারঃ২/৫৩০)

৯. শোক প্রকাশ করার জন্য কালো ও সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরিধান করা। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৪)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১০. এই দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করার জন্য মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করা। কারণ হাদীসে "মিথ্যা হাদীস" বর্ণনাকারীকে জাহান্নামে ঠিকানা বানিয়ে নিতে বলা হয়েছে। (বুখারীঃ হাঃ নং ১০৭)

এখানে আশুরার দিনের নিন্দিত ও গর্হিত কাজসমূহের কিছু নমুনা পেশ করা হলো মাত্র। মূলকথা, বক্ষ্যমাণ পর্চার 'করনীয়' শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত ৩টি আমল ব্যতীত এই দিনে আর কোন বিশেষ আমলের কথা শরী'আতে প্রমাণিত নেই। তাই এই হলো ব্যতীত আশুরাকে কেন্দ্র করে বিশেষ যে কোন কাজই করা হবে তা বিদ'আত ও মনগড়া আমল হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে শিরক, বিদ'আত ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন।

সফর মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

ঈমান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আমরা যেন ঈমানের উপর কায়েম থাকতে পারি তাই দয়া করে মায়া করে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।"

আমরা যেন ঈমানের উপর কায়েম থাকতে পারি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে দূ'আ করতে বলেছেন এবং আরো আল্লাহর মেহেরবানী যে তিনি আমাদেরকে দূ'আ কিভাবে করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি এই দূ'আ দৈনিক কমপক্ষে বত্রিশবার বলা জরুরী করে দিয়েছেন। দূ'আ হলোঃ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "হে আল্লাহ আমাকে ঈমানের উপর সিরাতে মুস্তাক্বিমের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখো।" এই হলো এই দূ'আর আসল অর্থ।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহর রাসূল ﷺ বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। এই সমস্ত আক্বীদাকে শিরক বলেছেন। সফর মাসের ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল ﷺ সাবধান করে গেছেন। কেননা এই মাসকে নিয়ে কিছু আক্বীদা রয়েছে যা ঈমান বিধ্বংসী। নিম্নে এই মাস এবং তার সাথে সম্পর্কিত ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ক. আখেরী চাহার শোমবাহ। খ. আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়।

ক. আখেরী চাহার শোমবাহ

আখেরী চাহার শোমবাহ কথাটি ফার্সি। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে সফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো হয়ে থাকে। বলা হয় রাসূল ﷺ যে অসুস্থতার মধ্যে রবিউল আওয়াল মাসের শুরু ভাগে ইনতিকাল করেন, সে অসুস্থতা থেকে সফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয় বরং ও বিশুদ্ধ তথ্য হল, এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যে দিন রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা বেড়ে যায়, সেদিন ইহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে, মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব, সফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবাহকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা এবং ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়িয হবে না। [সূত্র : ফাতাওয়া রাহীমিয়া, খণ্ড ১]

শুধু তাই নয়, এই দিনে অনেকে একটি নামায আবিষ্কার করা হয়েছে। চাশতের সময়। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নাই। বিভিন্ন মুসলমান এই দিনে ছুটি পালন করে খুশিতে। খুবই আফসোসের বিষয় আল্লাহর রাসূলের ﷺ অসুস্থতা বেড়ে গেলো যেই দিনে ঐ দিনে মুসলমান খুশি উদযাপন করছে। এর চেয়ে কষ্টের বিষয় আর কী হতে পারে?!

খ. আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়

নবীয়ে কারীম ﷺ বললেন, *"লা আদওয়া, ওয়ালা তিয়ারতা, ওয়ালা হামাতা, ওয়ালা সফর।"* অর্থাৎ, সংক্রামক বলে কোন রোগ নেই, কোন অশুভ নেই, যে মরে যাবে সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসবে না, তোমরা সফর মাসকে অশুভ মনে করো না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এখানে চারটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

১. সংক্রামক বলে কোন রোগ নেই

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা যে বলো সংক্রামক রোগ বা ছোঁয়াচে রোগ আছে এটা ইসলাম সমর্থন করে না। কোন এক ব্যক্তি একবার নবীকে ﷺ প্রশ্ন করছিলেন, হুজুর আপনি যে বলেন ছোঁয়াচে রোগ নেই তাহলে একটা উঠের যখন চুলকানী হয় তখন এর আশে-পাশের উঠগুলোরতো হয়, এটা কেন? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তাহলে বলো প্রথম উঠেরটা কিভাবে হলো? প্রথম উঠের চুলকানী যেভাবে হয়েছে আশে-পাশেরগুলোর ঐভাবেই হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম উঠের চুলকানী রোগ আল্লাহ দিয়েছেন এবং বাকীগুলোকেও আল্লাহই দিয়েছেন।

একবার এক কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজের প্লেটে খানায় শরীক করলেন। আর দুর্বল ইমানওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “ফিররু মিনাল দুযাম কা ফিরারিকা মিনাল আসাদ।” বাঘ বা সিংহ দেখলে তোমরা যেভাবে পালাও এভাবে তার থেকে দূরে পালাও। কেননা তোমাকে যদি আল্লাহ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করে তাহলে তোমার দুর্বল ঈমান হওয়ার কারণে তুমি ভাবতে পারো যে তার সাথে খানা খাওয়ার কারণে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। এর দ্বারা তোমার ঈমান নষ্ট হতে পারে। অথচ রোগতো আল্লাহ দিয়েছেন। আমরা আমাদের পরিবেশে এর অনেক প্রমাণ দেখতে পাই। বসন্তকে ছোঁয়াচে রোগ বলা হয়। তাই এই ভেবে মানুষ, যার বসন্ত হয় তার থেকে দূরে থাকে। অথচ যে সন্তানের বসন্ত হয়েছে তার মা তাকে গোসল করিয়ে দেয়, খাবার খাওয়ায়, রক্ত-পুঁজ মুছে দেয় এমনকি কোন কোন সময় মায়ের গায়ে সন্তানের ঘাঁ এর পুঁজ রক্ত লাগে। কিন্তু মায়ের বসন্ত হতে দেখা যায় না। তাই আক্বীদা রাখতে হবে ছোঁয়াচে রোগ নাই, রোগ-বালাই আল্লাহর হুকুমে হয়।

২. কোন অশুভ নেই

ইসলামে কোন অশুভ নেই। শুভ আছে। কুরআন শরীফে সূরা ইয়াসীনের ২য় পৃষ্ঠায় এক ঘটনা এসেছে। হাবীবে নাজ্জার নামের এক আল্লাহর অলী তার কওমকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। আর তার কওম শুধু শুভ-অশুভ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। মনগড়া কিছু কাজকে শুভ মনে করতো আর কিছু কাজকে তারা অশুভ মনে করতো। ঐ জমানার লোক তাঁর দাওয়াতকেও অশুভ মনে করতো। আর বলতো খবরদার তার কথা শুনো না। তোমরা যদি তার কথা শুনো তাহলে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হাবীবে নাজ্জার তাদেরকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বললেন, ‘বাল আনতুম কওমুম মুসরিফুন’ তোমরাতো সিমালঙ্ঘনকারী কওম। তোমরা আমার দাওয়াতকে অশুভ মনে করছো। এই ধরনের লোক এখনো আছে। অনেক লোক আছে যারা আলেম-উলামাদের অনেক শ্রদ্ধা করে মুহাব্বাত করে। হাদিয়া পেশ করে দাওয়াত করে খাওয়ায়। হজ্জের টিকিট দিচ্ছে। কিন্তু নিজের ব্যবসা বা চাকরীর হালত আলেমদের কাছে বলে না। কারণ তারা আলেমদেরকে বলা অশুভ মনে করে। ঐ হাবীবে নাজ্জার রা. কওমের মতো এই কথা মনে করে যদি হুযুরকে বলো তো তোমার ব্যবসা বা চাকরী একদম শেষ হয়ে যাবে। এই শুভ-অশুভ খোঁজা হিন্দুদের রীতি। ওরাই পঞ্জিকা বের করে। যাত্রা শুভ না যাত্রা নাস্তি। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ‘আত তিয়ারাতু শিরকুন’। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তোমরা যে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করো এটা শিরক। এটা ইমানকে ধ্বংস করে দেয়।

সফর মাসের বদরুসুম অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। জাহিলিয়্যাতের যামানা থেকে এই শুভ-অশুভ চিন্তা করার রীতি চালু ছিলো। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে তা এখনো আমাদের সমাজে জারি আছে। অথচ এই সকল আক্বীদা আমাদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ কারো কোন কাজ অসম্পূর্ণ হলে বলে উঠে, “আজ সকালে কার চেহারা দেখে ঘর থেকে বের হয়েছি!,” আবার কাজে বের হতে গেলে সামনে দিয়ে সাপ গেলে মনে করে আজ আর তার কাজ ঠিক মতো হবে না, ঘর থেকে বের হয়ে কোন অন্ধ লোকের দিকে নজর গেলে কু-লক্ষণ মনে করে ইত্যাদি। এর সবই স্পষ্ট শিরক।

অনেকে মুহাররম মাসে বিয়ে করতে চায়না। এই মাসে ইমাম হুসাইন রা. শহীদ হয়েছেন বলে তারা এই মাসে বিয়ে করাকে অশুভ মনে করে। এই ধারনাও শরী‘আত বিরোধী।

এই ধরনের অশুভ ধারনা করা শরী‘আত সম্মতী দেয় না। তবে শুভ দিকের আলামত রয়েছে। এতে নিষেধ নাই। কারণ এতে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করা হয়। যেমনঃ কেউ ঘর থেকে বের হলো কোন কাজের উদ্দেশ্যে আর পথে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে দেখা হলো তো ধারনা করলো যে তার কাজে আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ। এমন ধারনা শরী‘আত সম্মত ধারনা। যেমনঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি করার সময় মক্কার কয়েকেজন নেতা কাফেরের পক্ষ থেকে সন্ধি নিয়ে এসেছিলো কিন্তু একবারও বনিবনা হচ্ছিল না। এরমধ্যে চতুর্থবার কাফেরের পক্ষ থেকে যে নেতা আসছিলো তাকে দূর থেকে দেখেই আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, সূহাইল যেহেতু আসছে এখন আমাদের এই কাজ সহজ হয়ে যাবে। কারণ “সুহাইল” শব্দের অর্থ “সহজ”। তার নামের দিকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইশারা করে ভাল লক্ষণ বের করলেন। এবং সত্যি তাই হয়েছিলো। তাই ভালো লক্ষণ বের করা আল্লাহর রহমতের আসা করার মত।

৩.পূনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা

জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষ মনে করতো যে তারা কেউ মারা গেলে আবার তারা দুনিয়াতে অন্য কোন প্রাণীর রূপ নিয়ে আসবে। বর্তমানেও অনেক মুসলমান এমন মনে করে তবে একটু ভিন্ন তরীকায়। যেমন অনেকে রাতে পানি ফেলে না। কারণ তাদের ধারনা তাদের আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছেন তারা রাতে বাসার আশে-পাশে চলে আসেন এবং তাঁরা দেখেন কেউ তাদের জন্য সাওয়াব রেসানি করছে কিনা। তাই যদি পানি ফেলি তাহলে তাদের গায়ে লাগলে কষ্ট পাবে এবং আমাদেরকে বদদূ'আ দিবেন।

৪. সফর মাসকে অশুভ মনে করা

বর্তমান মাসের নাম হলো صفر 'সফর'। আর আমরা যে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় ভ্রমণ করি একে বলে سفر 'সফর' । বাংলায় এক হলেও আরবী বানান ভিন্ন। এবং অর্থও ভিন্ন। জাহিলিয়্যাতের যামানায় মনে করা হতো এই মাসে কোন খায়ের ও বরকত নেই। তাই তারা এই মাসে কোন সফর করতো না। আর তখন তাদের সফরের উদ্দেশ্য থাকতো ব্যবসা। ঐ যামানায় তারা গরমের দিনে উত্তর দিকে ব্যবসা করতে যেতো। ঐ দিকে পাহাড় ছিলো। তাই ঐ সময় ঐ দিকটা একটু আরাম ছিলো। আবার শীতের দিনে তারা ইয়েমেনে (এডেন) সফর করতো। ঐ সময় ওখানে সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় আরাম থাকতো। সারা বছরে তারা দুটা সফর করতো। আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সারা বছরের রিযিক দুই সফরে সম্পূর্ণ করে দিই। (রিহ লাতাশ শিতা-ই ওয়াস সইফ-সূরা কুরাইশ)

কখনো যদি তাদের গরম বা শীতের কোন সফরের সময় (ব্যবসায়িক ভ্রমণের সময়) আরবী সফর মাস চলে আসতো তখন তারা তাদের এই সফরকে শুভ মনে করতো না। তাদের ধারনা মতে এই সফরে তাদের ক্ষতির আশংকা আছে। কিন্তু সফরতো (ভ্রমণ) আর বন্ধ করার কোন রাস্তা নাই। কেননা এই সফরে তাদের বছরের অর্ধেক কামাই। যেহেতু তারা শীত বা গরম আসার আগেই গণনা করতো যে তাদের এই সফরে,আরবী সফর মাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই তাদের গোত্রের নেতারা এক সাথে বসে মিটিং করতো। মিটিং-এ নির্ধারণ করতো এবার সফর মাসকে পিছিয়ে দেয়া হোক। অর্থাৎ মুহাররম মাসের পরে এবার রবিউল আউয়াল মাস আসবে তারপরে সফর মাস গণনা করা হবে। আর

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারা ধারনা করতো তারা মুহররম মাসের পরের মাস রবিউল আউয়াল মাসে সফর করছে। এভাবে নিজেকে বুঝ দিয়ে অশুভ ধারনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো। তারপর ব্যবসায়িক সফর থেকে ফিরে এসে সফর মাসের ঘোষণা করতো। তাদের এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে দশম পারায় আয়াত নাযিল হলোঃ 'ইন্না মান নাসিউ যিয়াদাতিন ফিল কুফর'। তোমরা যে তোমাদের ইচ্ছামতো মাসকে আগে-পিছে করো এটা কুফরি কাজ।

আমাদের সমাজে এমন আরো অনেক কুলক্ষণ-সুলক্ষণ বের করে তার উপর আমল করে যা সম্পূর্ণ শিরক বা কুফর। নিম্নে এর একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

শরী'আতের আক্বীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কু-লক্ষণের তালিকা

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থকড়ি আসবে মনে করা।

২. চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা।

৩. কুত্তা কান্নাকাটি করলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।

৪. এক চিরুনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে এই দু'জনের মাঝে ঝগড়া লাগবে মনে করা।

৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।

৬. যাত্রাপথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা খারাপ হবে মনে করা।

৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেয়র দেখলে বা কাল কলসি দেখলে কিংবা বিড়াল দেখলে-কু-লক্ষণ মনে করা। অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা কোন দিন বা কোন মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।

৮. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না-এমন বিশ্বাস করা।

৯. পেঁচা ডাকলে ঘরবাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।

১০. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে মনে করা।

১১. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।

১২. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা।

১৩. কোনো লোকের আলোচনা চলছে, এই ফাঁকে বা এর কিছুদিন পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ মনে করা।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১৪. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে সেই ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে মনে করা।

১৫. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।

১৬. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিস্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।

১৭. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চা মারা যাবে মনে করা।

১৮. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।

১৯. কোন প্রাণী বা প্রাণীর ডাককে অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ধরণের আরো অনেক ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেসব থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে বাছাই করে উল্লেখ করা হল। এসব নেয়া হয়েছে "আগলাতুল আওয়াম" গ্রন্থ থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর রেওয়াতে একটি হাদীস এসেছে "জাহিলিয়্যাতের যামানায় যেমন মানুষ বিভিন্ন কু-লক্ষণ চিন্তা করে। আমাদের মনে ঐ চিন্তা আসতে পারে। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে এক ধরনের ওয়াসওয়াসা। আমরা তা আমলে নিবো না।" আমলে না নিলে আমাদের ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। আমলে নিলেই ঈমানের ক্ষতি।

আমাদের সমাজে এ-সম্পর্কিত আরো কিছু আক্তীদা রয়েছে যা ঈমান বিধ্বংসী। যেমনঃ

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আক্বীদা

রাশি হল সৌর জগতের কতগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়। যথা-মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র [অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ সংঘটিত হতে পারে। এভাবেই শুভ অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আক্বীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াত-৫৭]

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে, এই আক্বীদা রাখা শিরক। তবে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোনো প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোনো প্রভাব থাকেও তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও তারই নিয়ন্ত্রণে। [সূত্র:ফাতহুল মুলহিম।]

রত্ন ও পাথরের প্রভাব বিষয়ে আক্বীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে-এরূপ আক্বীদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়। [সূত্র : আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল।]

হস্ত রেখা বিচার বিষয়ে আক্বীদা

পামিষ্ট্রি (Pamistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয়ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী। [সূত্র:আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল, প্রথম খণ্ড।]

নজর ও বাতাস লাগার বিষয়ে আক্বীদা

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে গেলে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতি আপনজনের বদনজর লাগতে পারে। এমনকি সন্তানের প্রতিও মা-বাবার বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তা হলে এটাও সত্য। কেননা, জিন-ভূত মানুষের ওপর আছর করতে সক্ষম।

কেউ কারো কোন ভালো কিছু দেখলে যদি মাশাআল্লাহ বলে তা হলে তার প্রতি বদনজর লাগে না। আর কারো ওপর কারো বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ হাত [কনুইসহ] হাঁটু এবং ইসতিনজার জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার ওপর নজর লেগেছে তার ওপর ঢেলে দিলে আল্লাহ চাহে তো ভালো হয়ে যাবে। বদনজর থেকে হিফাযতের জন্য কাল সূতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আক্বীদা

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন দু'আ করা হলে রোগ ব্যাধি আরোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আরোগ্য লাভ হবে, তা না হলে নয়। এমনিভাবে তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকও একটি দু'আ। মনে রাখতে হবে তাবীজের চেয়ে কিন্তু দু'আ আরো বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই তা হয়ে থাকে।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই ইজতিহাদ এবং কুরআন থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীসে যার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাজ হবে। অতএব, কোনো তাবীজ বা কোন ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এমন ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন ও হাদীস কি তা হলে সত্য নয়?

যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব-নকশার অর্থ জানা যায় না, তার দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে-এমন মনে করা ঠিক নয়।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক-এমন ধারণা করাও ভুল।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভালো আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমিলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]

আর মনে রাখতে হবে ঈমান না থাকলেতো তার কোন আমলই আল্লাহর নিকট পৌঁছাবে না। একে ভালো কাজ বা নেক আমল বলা যাবে না। ভালো কাজ করলেই তাকে ভালো কাজ বলা যায় না। শরী'আতের ভাষায় ভালো কাজের সংজ্ঞা ভিন্ন। প্রথমতঃ তার বিশুদ্ধ ঈমান থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর হুকুম থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ নবীর ﷺ তরীকা থাকতে হবে। ঈমানহীন ব্যক্তির বা শিরকযুক্ত ঈমানওয়ালার কোন ভালো কাজ তথা-নামায, রোজা, দান-সদকা কিছুই ভালো কাজ হিসেবে ধরা হবে না। এর কোন নেকী সে পাবে না। শর্ত হলো ঈমান।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাই ঈমান কী কী কারণে নষ্ট হয়ে যায় তার ইলম থাকতে হবে। যেন ঈমানের হেফাজত করতে পারি। ঈমানের কিতাবের তালিম হতে হবে ঘরে-ঘরে, মসজিদে-মসজিদে। (এর জন্য লেখক মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর কিতাব "কিতাবুল ঈমান" খুবই উপকারী)

রবিউল আউয়াল মাসে করণীয় বর্জনীয়

রবিউল আউয়াল মাসে দু'টি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ক. প্রচলিত মীলাদ শর'ঈ বিধান।

খ. নবীজী ﷺ এর জন্ম ও মৃত্যুর বিশুদ্ধ তারিখ।

ক. দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শর'ঈ বিধান

দুরূদ ও সালামের গুরুত্ব

১। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করার জন্য সকল ঈমানদারকে আহ্বান জানিয়েছেন।

২। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ "তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করো, তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর দুরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকলো, সে বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯০৮, বাইহাকী শুআবুল ঈমান হাদীস নং ১৪৭২)

দুরূদ ও সালামের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলা বহু সংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীর যমীনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার জন্য দুরূদ ও সালাম পাঠাবে তারা তা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমার নিকট পৌঁছে দিবে। (শুআবুল ঈমান, বাইহাকী হাদীস নং ১৪৮২, নাসাঈ হাদীস নং ১২৮০)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ নবীজী ﷺ এর নিকট প্রেরণকারীর নাম উল্লেখ করে তার দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার দুরূদ পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পাঠ করবে কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। (ত্বারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ১/১২০)

দুরূদ ও সালাম সম্পর্কীয় মাসাইল

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে একবার দুরূদ পাঠ করা ফরযে আইন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৪)

যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবীজী ﷺ এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের জন্য দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, পরবর্তী প্রত্যেকবার নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী রাহ. পরবর্তী প্রত্যেকবারও সকলের জন্য দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব বলেছেন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)

কেউ যদি নবীজী ﷺ এর নাম মুবারাক একই মজলিসে বারবার লিখেন, তাহলে তার হুকুমও অনুরূপ, অর্থাৎ প্রথমবার দুরূদ লিখা ওয়াজিব পরবর্তীবার লিখা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)

বিনা উযূতে, শুয়ে-বসে, হাঁটা-চলা সর্বাবস্থায় নবীজী ﷺ এর উপর দুরূদ পড়া যায়।

জুমু'আ বা ঈদের খুতবায় নবীজী ﷺ এর নাম আসলে অন্তরে অন্তরে দুরূদ পড়বে, মুখে উচ্চারণ করবে না।

দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো, দিলে অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দুরূদ শরীফ পড়ার সময় ঢুলতে থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা উচিত নয়। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নতুন ঘর-বাড়ী, দোকান, অফিস ইত্যাদি উদ্বোধনের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ যথাস্থানে পড়বে। যেটা দুরূদ পড়ার কোনো স্থান নয় বরং দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য সামনে আছে, এমন স্থানে দুরূদ পড়ার রুসূম বানানো বা দুরূদ পড়ার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন: নতুন ঘর-বাড়ি, দোকান ইত্যাদি উদ্বোধন করার সময়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, দুই রাকা'আত শুকরিয়ার নামায পড়া বা হক্কানী আলেম দ্বারা বয়ানের ব্যবস্থা করা। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৮)

দুরূদ শরীফ পড়ার স্থান হলো, নবীজী ﷺ এর রওযা শরীফ যিয়ারাতের সময়, নবীজী ﷺ এর নাম বলা বা শোনার সময়, মসজিদের প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময়, কোনো মজলিস থেকে উঠার সময়, দু'আ বা মুনাজাতের আগে এবং পরে। আযানের পর দু'আর আগে, উযূর শেষে, কিতাব বা চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লিখার পূর্বে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কোনো প্রথা পালন না করে নবীজী ﷺ এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় বেশি বেশি দুরূদ পড়া। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬, আল কাউলুল বাদী পৃ.৩১৮)

সহীহ মীলাদের পদ্ধতি

আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মাত, পৃথিবীর সবকিছু থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুহাব্বাত এবং ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। এটা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে সহীহ তরীকায় মীলাদ পড়া আমাদের কর্তব্য। হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. "ইসলাহুর রুসূম" গ্রন্থে মীলাদের সহীহ পদ্ধতি লিখেছেন, প্রচলিত মীলাদের সাথে সামঞ্জস্যতা না রেখে; দিন, তারিখ, সময়, পূর্ব থেকে নির্ধারিত না করে, ডাকাডাকি ছাড়া ঘটনাচক্রে কিছু লোক একত্রিত হয়ে গেল বা কোন প্রয়োজনীয় কাজে বা বয়ানের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল, তখন উপস্থিত লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত তরীকা এবং জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা, এরপর কুরআন থেকে কিছু সুরা পড়ে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে হালকা আওয়াজে একাকী দুরূদ শরীফ পড়বে। অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে এক আওয়াজে পড়বে না। মীলাদে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, ইয়া হাবীব ইত্যাদি কিছুই পড়বে না, তাওয়ালুদ করবে না, কিয়াম করবে না, কেননা এসবের কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য কোন কোন কিতাবে মীলাদের কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই সহীহ তরীকার মীলাদ যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের আলোচনা হয় এবং সহীহ দুরূদ পড়া হয়। প্রচলিত গলদ মীলাদ কোন অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তারা কেউ এ গলদ মীলাদ পড়তেন না।

সমাজে যেভাবে মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন রয়েছে

যেখানে একজন আলেম সাহেব তাওয়ালুদ পড়েন এবং কবিতা পাঠ করতে থাকেন, ফাঁকে ফাঁকে সকলে একসাথে দুরূদ পড়েন, এর মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বা বসে 'ইয়া নবী সালামালাইকা', 'ইয়া রাসূল সালামালাইকা', 'ইয়া হাবীব সালামালাইকা' এরূপ দুরূদ পড়েন, এর কোনো দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া, তাই এর থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য। (সূরা আনআম-৫৯, সুরা নামল-৬৫, তাফসীরে কুরতুবী-১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কাযিখান-১/৩৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৪৮)

উল্লেখ্যঃ তাওয়ালুদ নামে যা পড়া হয় এটা কুরআন-হাদীসে নেই। তারপর আরবী-ফার্সী-বাংলা কবিতা পড়া হয়, তাও শরী'আতে নেই, তার অর্থও ভুল। "ইয়া নবী" ওয়ালা যে দুরূদ পড়া হয় তাও হাদীসের কোন কিতাবে নেই এবং আরবী গ্রামার এর দিক দিয়ে তা ভুল, তার অর্থও ভুল। তারপর নামাযের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় বসে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম আর এখানে সেটা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ জীবদ্দশায় পছন্দ করেননি বরং নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

যেহেতু আমাদের সমাজে এ মীলাদ-কিয়াম নিয়ে বহু দিন থেকে বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, দেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এটাকে নাজায়েয বললেও সাধারণ মানুষ এটাকে বিদ'আত বলতে রাজি নয়, এর মূল কারণ হলঃ মীলাদ-কিয়ামের সমর্থক এর সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

তাই মীলাদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল, যাতে সকলে এর প্রকৃত ইতিহাস জেনে এর থেকে বিরত থাকতে পারে।

মীলাদের ইতিহাস

প্রচলিত মীলাদের সূচনাঃ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনের সময়ে প্রচলিত পন্থায় মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের সূচনাকাল থেকে সুদীর্ঘ ছয়শ বছর পর্যন্ত এই মিলাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মিলাদ সমর্থক এবং মিলাদ বিরোধী সকলেই একমত। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী থেকে আজকের প্রচলিত মিলাদের যাত্রা শুরু হয়। এই মীলাদের এক জন বড় পৃষ্ঠপোষক মৌলভী আব্দুস সামী 'আনওয়ার সাতিহাতে' একথা স্বীকার করেছেন। চিত্তবিনোদনের জন্য এই মীলাদের আয়োজন করা বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে মীলাদ করার প্রচলন আগে ছিল না। এই প্রথা এসেছে হিজরী ৬০৪ এর শেষের দিকে। (বারাহীনে কাতেআহ, পৃ.১০৩, তারিখে মিলাদ পৃ.১৩)

মূলকথা হলো প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার হিজরী ছয় শতকের পরে হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়াঃ পৃ.১১৪)

মোট কথা নবীজী ﷺ এর ২৩ বছর নবুওয়্যাতের যুগে, এরপর ১১ হিজরী থেকে চল্লিশ হিজরীর ১৭ রমযান আনুমানিক ত্রিশ বছর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। এরপর কমবেশি ১২০ হিজরী সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগ। এরপর কমবেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ। এরপর ৪০০ হিজরী পর্যন্ত ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের যুগ, অতঃপর আরো ৬০৩ হিজরী পর্যন্ত তৎকালীন উলামায়ে কেরামের যুগেও এই প্রচলিত মীলাদের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী মোতাবেক ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রচলিত মীলাদের প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং প্রচলিত মীলাদ নিঃসন্দেহে বিদ'আত এবং নাজায়েয। যার কোনো ভিত্তি শরী'আতে নেই।

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারকঃ

মীলাদ যারা সমর্থন করেন এবং যারা এর বিরোধিতা করেন, তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে হিজরী ছয় শতকে ইরাকের মসূল এলাকায় উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী এই প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারীখে মীলাদঃ পৃ.১৫)

মৌলভী আব্দুল হক মুহাজেরে মক্কী রাহ. এর লেখা কিতাব 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফী হুকমি আমালি মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযাম' পৃ.১৬০ এ মুফতী সা'দুল্লাহ সাহেব বলেন, প্রচলিত মীলাদ রবিউল আউয়াল মাসে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে সম্পাদন করার নিয়ম সর্বপ্রথম ইরাকের মসূল শহরে হয়েছে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এখানে উমর বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)

মৌলভী মুহাম্মাদ আযম সাহেব লিখেন, জানা দরকার যে, এই পবিত্র মীলাদের আবিষ্কারক হযরত শায়খ উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী। (ফাতহুল ওয়দূদ পৃ.৮ এর সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)
প্রচলিত মীলাদ সর্মথক জনাব মৌলভী আব্দুস সামী সাহেব লিখেন, সর্বপ্রথম এই প্রচলিত মীলাদ ইরাকের মসূল শহরে শায়খ উমর আবিষ্কার করেন। (আনওয়ারে সাতিহা সূত্রে বারহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৪)

সারকথা হলো, নবীজী ﷺ এর ইন্তেকালের ছয়শত বছর পর্যন্ত এই মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হিজরী ৬০৪ সালে সর্বপ্রথম শায়খ উমর ইরাকের মসূল শহরে এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। আর তার অনুসরণ করেছিলেন বাদশাহ আরবীল আবূ সাঈদ কাওকারী, তিনিই মূলত এই মীলাদের প্রসার করে ছিলেন। (বারাহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৩-৬৪)

আবিষ্কারক কেমন ছিলেন?

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস বা ফকীহ কিছুই ছিলেন না। ইলম ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তার পরিচিতি মূলত বাদশাহ আরবীল এর মাধ্যমেই হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও মহামানুষীগণ তীব্র ও কঠিন ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। যেমন: আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী বলেন, প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার করেছে ভ্রষ্ট ও চিত্তপুজারী লোকেরা এবং পেটপুজারী লোকেরা এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। (তারীখে মীলাদ পৃ.১৮)

প্রচলিত মীলাদ সর্বপ্রথম শায়খ উমর এবং বাদশাহ আরবীল আবিষ্কার করেছেন। তারা দুজনেই বিজ্ঞ আলেমদের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য এবং অগ্রহণীয় ছিলেন। কারণ তারা উভয়েই গান-বাদ্য বাজাতেন। (তাওযীহুল মারাম ফী বায়ানিল মাওলিদি ওয়াল কিয়াম সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৮)

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ ছিল বিদ'আতী। বিজ্ঞ আলিমদের চোখে সে ছিল অবিশ্বাসযোগ্য। কোনো বিজ্ঞ আলমের চোখে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আচ্ছা বলুন তো যে ব্যক্তি নিজেই তৎকালীন উলামায়ে কেরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিল।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এমন একজন মানুষের আবিষ্কৃত আজকের প্রচলিত মীলাদ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আল্লাহ আমাদের বিবেকের দুয়ার খুলেদিন।

বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণামঃ

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম বিদ'আত। আর বিদ'আত ভয়াবহ গুনাহের কাজ। এক দিকে এই বিদ'আত কুফুর, শিরিক এর পরেই সর্বাধিক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক গুনাহ। অপর দিকে এ থেকে তাওবাও নসীব হয় না। কেউ সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়াতে লিপ্ত হলে এগুলো গুনাহ মনে করে এক সময় তা থেকে তাওবা করে নেয় বা তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু বিদ'আত নাজায়েয ও কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত তা নেক আমলের মত হওয়ার কারণে সকলেই তা সাওয়াবের নিয়তে করে থাকে। এ কারণে কখনোই তা থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। ভাবে সাওয়াবের কাজই তো করছি এর জন্য আবার তাওবা কিসের। পরিশেষে তাওবা করা ছাড়াই মারা যায়। এজন্য বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরী। কেননা হাদীসে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীজী ﷺ বলেন, 'তোমরা বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কৃত আমল থেকে কঠোরভাবে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত আমলই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য এবং প্রত্যেক বিদ'আঁতই গোমরাহী। (তিরমিযী পৃ.২৯২, আবূদাউদঃ২/২৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ৪/২৭)

অপর এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নামায-রোযা, দান-সদকা, হজ্জ-উমরাহ, জিহাদ, ফরয ইবাদাত ও নফল ইবাদতসহ কোনো আমলই কবুল করবেন না। আটার খামির থেকে চুল যেমন খুব সহজেই বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনই বিদ'আতী ব্যক্তিও ইসলাম থেকে নিজের অজান্তেই বের হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ পৃ.৬)

অপর এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতী ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।' (কানযুল উম্মাল ১/২২০)

সর্বোপরি বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই "দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছে" বলে হাউজে কাওসারের পানি থেকে চিরবঞ্চিত করে দিবেন। (বুখারী/মুসলিম)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বর্তমান সমাজে মীলাদ-কিয়ামের ব্যাপক প্রচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক মসজিদে মীলাদও হয়, সাধারণ মুসল্লিরা ব্যবসায় উন্নতি, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় পাস আর পড়া-লেখার উন্নতি, কামাই-রোজগারের উন্নতি, বালা-মুসীবত এবং বিভিন্ন পেরেশানি থেকে মুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মীলাদ পড়িয়ে থাকেন, নতুন ঘর-বাড়ি বা দোকান হলে সেখানে বরকতের জন্য এবং সওয়াবের নিয়তে মীলাদ দিয়ে থাকেন। অথচ ইসলামে এর কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে, সাহাবা কেরামের যুগে এমনকি তাবেঈন এর যুগেও মীলাদ-কিয়ামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং নাজায়েয। সকলের কর্তব্যঃ এর থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা। নকল জিনিস দেখতে প্রায় আসলের মত হলেও দামে আসল জিনিসের মত হবে না। শুধু তাই নয়, আসলের মত বানাতে পেরেছে বলে নকলকারীকে পুরষ্কার দেওয়া হবে না, বরং নকল করার অপরাধে কঠিন শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

যেহেতু সকল বিদ'আত ইসলামে নকল আমল হিসেবে গণ্য, তাই বিদ'আতকারী পুরষ্কারযোগ্য তো নয়ই বরং বিদ'আত করার অপরাধে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিযোগ্য। যদিও সাধারণ লোকদের নিকট বিদ'আত দেখে তো বাহ্যত নেক আমলের মতোই মনে হয়, কিন্তু এটা যে বিদ'আত এবং নকল আমল তা বুঝতে আমল বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কোনো কষ্টই হয় না। তাই সকলের জন্য কর্তব্যঃ এ সকল বিদ'আত কাজ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

ফাতাওয়ার আলোকে প্রচলিত মীলাদ বিদ'আত এবং নাজায়িযঃ

অসংখ্য ফাতাওয়ার কিতাবে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামকে বিদ'আত ও নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ফাতাওয়ার কিতাবের প্রমাণ পেশ করা হলোঃ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা ও যিকির-আযকার করার মাঝে সওয়াব রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্যে যে সুন্নাত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পরিপন্থী গর্হিত নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, এই নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈন এর কোনো যুগেই ছিল না। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এধরনের মজলিস থেকে দূরে থাকাই সওয়াবের কাজ। (সূত্র: খাইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭)

২. প্রচলিত মীলাদ মজলিসের আয়োজন করা ভিত্তিহীন এবং বিদ'আত, সুতরাং এটা নাজায়িয। (সুত্রঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/১৯০)

৩. বর্তমানে যে প্রথা স্বরূপ মীলাদের মজলিস কায়েম করে তথায় দ্বীনী বিষয় অজ্ঞ কবিদের কবিতা এবং গর্হিত ও মনগড়া বর্ণনা সুর দিয়ে পড়া হয় এবং এই প্রচলিত পন্থায় মীলাদ পড়াকে জরুরী মনে করা হয়, এই মীলাদ-মাহফিল সুন্নাত পরিপন্থী এবং বিদ'আত। এই গর্হিত পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম কারো থেকেই প্রমাণিত নেই।

৪. প্রচলিত পন্থায় যে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়, তা কুরআন-হাদীস এবং ফিকহের কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনো এমন করেননি, তাবেঈনগণ করেননি, তাবে তাবেঈনগণ করেননি; আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের কেউ করেছেন বলেও জানা যায়নি। ছয়শত হিজরী পর্যন্ত এই মীলাদ কেউ করেননি, এরপর সুলতান আরবিল সর্বপ্রথম এর প্রচলন ঘটায়।

এ ছাড়াও দেখুন: (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/২৮২, ইমদাদুল মুফতীন-১৭২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযুল ফাতাওয়া-পৃ. ৯৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/১৯৭, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-২২৮-২২৯, ইমদাদুল আহকাম-পৃ. ৯৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/২১১)

খ. নবীজী ﷺ এর জন্ম ও মৃত্যুর বিশুদ্ধ তারিখ

আমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত। তাই আমাদেরকে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা উচিত। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবেত্তাদের উদ্ধৃতির আলোকে আমরা নবীজী ﷺ এর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নবীজী ﷺ এর জন্ম তারিখ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবীজী ﷺ এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। তবে নবীজী ﷺ এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবার হয়েছে, এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সকল ইতিহাসবিদ উলামায়ে কেরাম একমত। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

জন্ম তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১.রবিউল আউয়াল এর দুই তারিখ।

২.রবিউল আউয়াল এর আট তারিখ।

৩.রবিউল আউয়াল এর দশ তারিখ।

৪.রবিউল আউয়াল এর বার তারিখ।

৫.রবিউল আউয়াল এর সতের তারিখ।

৬.রবিউল আউয়াল এর আট দিন বাকী থাকতে।

৭.রমযান মাসের বার তারিখ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

এসব বর্ণনার মধ্য থেকে হাফেজ ইবনে কাছির রহ. 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' এর মধ্যে 'দুই' 'আট' ও 'বার' তারিখের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা শুধু এই তিনটি তারিখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

আর মুহাম্মাদ বিন সাআদ রহ. 'তবাকাতুল কুবরা' নামক গ্রন্থে দুই ও দশ তারিখের মতকে গ্রহণ করেছেন। বার তারিখের মতটি প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এ মতটির আলোচনা তাঁর কিতাবে স্থান পায়নি। দুই ও দশ তারিখের পক্ষে পেশ কৃত তার দলীলসমূহ সনদসহ উল্লেখ করা হলোঃ

দুই তারিখের দলীলঃ

قال محمد بن سعد اخبرنا محمد بن عمر بن واقد الاسلمى الواقدى قال: كان ابو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدنى يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول.

'ইবনে সাআদ তার উস্তাদ ওয়াকেদী এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মা'শার আল-মাদানী বলতেন, রবিউল আউয়াল মাসের দুই তারিখ সোমবার নবীজী ﷺ জন্ম গ্রহণ করেছেন।' (তবাকাতে ইবনে সাআদ ১/৪৭)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এ বর্ণনার রাবী ওয়াকেদী ও তার উস্তাদ আবূ মা'শার উভয়েই 'যয়ীফ'। রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রহ. ওয়াকেদী সম্পর্কে বলেনঃ متروك مع سعة علمه 'প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরিত্যাজ্য।' তাকরীবুত তাহযীব পৃ.৪৯৮) আর আবূ মা'শার সম্পর্কে বলেছেনঃ ضعيف 'সে যয়ীফ' (তাকরীব পৃ. ৫৫৯) অতএব দুই তারিখের বর্ণনাটির বর্ণনাকারীরা মাতরুক ও যয়ীফ হওয়ায় এমতটি গ্রহণ করা গেল না।

দশ তারিখের দলীলঃ

দশ তারিখের দলীলের সূত্রেও ওয়াকেদী রয়েছেন। তাই দশ তারিখের দলীলটিও মাতরুক বিবেচিত হবে। (তবাকাতুল কুবরা ১/৪৭)

আট তারিখের দলীলঃ

জেনে রাখা উচিত যে, হস্তি বাহিনী যে বছর মক্কায় হামলা করেছিল সেবছরই রবিউল আউয়াল মাসে নবীজী ﷺ এর জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সকল ইতিহাসবিদ উলামায়ে কেরাম একমত।

ইবনে কাছীর রহ. বলেনঃ

قال ابن اسحاق: وكان مولده عليه السلام عام الفيل وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال ابراهيم بن المنذر الحزامي: هو الذي لا يشك فيه احد من علمائنا انه عليه السلام ولد عام الفيل.

'ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক বলেছেন, নবীজী ﷺ এর জন্ম হস্তি বাহিনীর বছর হয়েছিল। এটিই জমহুরের নিকট প্রসিদ্ধ অভিমত। আর ইবরাহীম বিন মুনযির রহ. বলেন, নবীজী ﷺ এর জন্ম হস্তি বাহিনীর বছর হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উলামাদের নিকট কোনো সন্দেহ নেই।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮৩)

অতএব, এতটুকু নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হলো যে, হস্তি বাহিনীর মক্কায় আক্রমণের বছর নবীজী ﷺ এর জন্ম হয়েছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, হস্তি বাহিনীর হামলার কয়দিন পর নবীজী ﷺ এর জন্ম হয়েছিল? হাফেজে হাদীস ইমাম সুহায়লী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম মাসঊদী রহ. এর নিকট বিশুদ্ধতম মত হল, হস্তি বাহিনী মক্কায় হামলার পঞ্চাশ দিন পর নবীজী ﷺ জন্ম গ্রহণ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করেছেন। আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন মূসা আল খাওয়ারেযেমী রহ. বলেন, হস্তি বাহিনী মক্কায় হামলা করে মুহাররম মাসের তের দিন বাকী থাকতে। তখন থেকে পঞ্চাশ দিন পর নবীজী ﷺ জন্ম গ্রহণ করলে জন্ম দিবস আটই রবিউল আউয়াল হয়। অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, উল্লেখিত বড় বড় ইমামদের মতে নবীজী ﷺ এর জন্ম হয়েছিল আটই রবিউল আউয়াল। আরো বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ (সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১/৩৩৫)

আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল কসতালানী আট তারিখের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেনঃ

وقيل لثمان خلت منه, قال الشيخ قطب الدين: هو اختيار اكثر اهل الحديث, ونقل عن ابن عباس و جبير بن مطعم وهو اختيار من له معرفة بهذا الشان, واختاره الحميدى و شيخه ابن حزم , وحكى القضاعى فى عيون المعارف اجماع اهل الزيج(اى الميقات) عليه, ورواه الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم وكان عارفا بالنسب وايام العرب اخذ ذالك عن ابيه.

‘কারো কারো মতে নবীজী ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। শায়েখ কুতুবউদ্দিন (আবূ বকর মুহাম্মদ বিন আহমাদ) বলেছেন, এ মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন এবং এ মতটিই হযরত ইবনে আব্বাস এবং জুবাইর বিন মুতইম রা. থেকে বর্ণিত আছে। তাছাড়া ইতিহাস সম্পর্কে যার নূন্যতম ধারণা আছে সেও এমতটিই গ্রহণ করবে। হুমাইদি ও তার উস্তাদ ইবনে হাযম রহ.ও এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং কুযায়ী (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সালাম) ‘উয়ূনুল মাআরেফ’ নামক গ্রন্থে আট তারিখে নবীজী ﷺ এর জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে মীকাতবাসীদের ঐক্যমতের কথা উল্লেখ করেছেন। এমতটিকেই হাফেজ যুহরী রহ. মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতইম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মাদ বিন জুবাইর নসবনামা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন। মুহাম্মাদ তার পিতা জুবাইর বিন মুতইম থেকে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য গ্রহণ করেছেন।’ (আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ ১/৮৫)

আল্লামা যারকাশী রহ.ও ‘শরহে যারকাশী আলাল মাওয়াহেব’ এর মধ্যে আট তারিখের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (শরহে যারকাশী আলাল মাওয়াহেব ১/২৪৬)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ এর মধ্যে আট তারিখের মতকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, তিনিও আট তারিখের প্রবক্তা। তিনি বলেনঃ

وقيل لثمان خلون منه, حكاه الحميدى عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم, ونقل ابن عبد البر عن اصحاب التاريخ انهم صححوه, وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمى, ورجحه الحافظ ابو الخطاب بن دحية فى كتابه التنوير فى مولد البشير النذير.

‘কেউ কেউ বলেছেন নবীজী ﷺ জন্ম গ্রহণ করেছেন রবিউল আউলায় এর আট তারিখ। এ মতটি হুমাইদী রহ. ইবনে হাযাম রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মালেক রহ., উকাইল (ইবনে খালেদ) ও ইউনুস বিন ইয়াযীদ ইমাম যুহরী এর সূত্রে, আর ইমাম যুহরী মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতইম এর সূত্রে আট তারিখের কথা বর্ণনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ স্প্যানিশ আলেম ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ আট তারিখের অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। তাছাড়া হাফেজে হাদীস মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারেযেমী নিশ্চিতভাবে আট তারিখকে সঠিক বলেছেন। আরেক হাফেজে হাদীস আবুল খাত্তাব উমর ইবনে হাসান ইবনে দিহইয়া স্বীয় গ্রন্থ ‘আত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর’ এর মধ্যে আট তারিখের অভিমতকেই প্রধান্য দিয়েছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

বার তারিখের দলীলঃ

হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. বার তারিখের দলীল সম্পর্কে বলেনঃ

وقيل لثنتي عشرة خلت منه, نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن عفان بن مسلم عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما انهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات, وهذا هو المشهور عند الجمهور والله اعلم.

‘ইবনে ইসহাক রহ. বার তারিখের মতটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবী শাইবা তার ‘মুসান্নাফ’ গ্রন্থে আফফান ইবনে মুসলিম এর সূত্রে সাঈদ ইবনে মীনা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাবের রা.ও ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবীজী ﷺ হস্তি বাহিনীর মক্কায় আক্রমণের বছর রবিউল আউয়াল মাসের বার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তারিখ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। আর রবিউল আউয়াল মাসে তাকে নবুওয়্যাত দেয়া হয় এবং এ মাসে তাঁর মে'রাজ হয় এবং এ মাসেই তিনি হিজরত করেন আর এ মাসেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন,) জমহুরের নিকট এ মতটিই প্রসিদ্ধ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮৩)

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

১. বার তারিখের দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করা হল। এই হাদীসের রাবী আফফান বিন মুসলিম ও সাঈদ বিন মীনা উভয়ে নির্ভরযোগ্য। তবে আফফান বিন মুসলিম সাঈদ বিন মীনা থেকে সরাসরি হাদীস শুনতে পাননি। কারণ সাঈদ বিন মীনার ইন্তেকাল হয় ১১০ হিজরীর দিকে। আর আফফান বিন মুসলিমের জন্মই হয় ১৩৪ হিজরীর দিকে। (সূত্রঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/২৫) এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আফফান বিন মুসলিম এবং সাঈদ বিন মীনা উভয়ের মাঝে একজন রাবী আছে যার নাম এই সনদে উল্লেখ করা হয়নি। তাই এই হাদীসটি মুনকাতে হয়ে গেল। আর 'মুনকাতে' হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. এই মতটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'এই মতটি জমহুরের নিকট প্রসিদ্ধ' লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই মতটিকে তিনি প্রসিদ্ধ বলেছেন বটে কিন্তু বিশুদ্ধ বলেননি; বরং আট তারিখের মতকেই তিনি প্রকারান্তরে বিশুদ্ধ বলেছেন। জেনে রাখা উচিত যে, সব প্রসিদ্ধ বিষয়ই বিশুদ্ধ হয় না; বরং সমাজে অনেক এমন প্রসিদ্ধ বিষয় রয়েছে যা বিশুদ্ধ নয়। আমাদের মনে হয় এখানেও তেমনটিই ঘটেছে।

যাই হোক উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত হল যে, বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম ও ইতিহাসবিদগণের মতে নবীজী ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। বার তারিখের দলীল সম্পর্কীয় হাদীস 'মুনকাতে'। তাই বার তারিখের অভিমত প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নবীজী ﷺ এর জন্ম তারিখঃ

নিকট অতীতের ভারত উপ-মহাদেশের কয়েকজন বরণীয় আলমের মতামত হল, নবীজী ﷺ ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী ও শায়খ সুলাইমান নদভী কর্তৃক যৌথভাবে উর্দূ ভাষায় রচিত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

‘সীরাতুন নবী’ নামক গ্রন্থে এবং শায়খ সফীউর রহমান কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত ‘আররাহীকুল মাখতূম’ নামক গ্রন্থে এই মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতের পথে দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে ‘সীরাতুন নবীর’ গ্রন্থকার বলেছেন, বিগত শতাব্দীর মিশরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেম মাহমূদ পাশা ফালাকী রহ. তার রচিত ‘নাতায়েজুল ইফহাম ফী তাকবীমিল আরব কাবলাল ইসলাম ওয়া ফী তাহকীকে মাউলিদিন নাবিয়্যি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম’ নামক গ্রন্থে গাণিতিক প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন যে, নবীজী ﷺ এর জন্ম মূলত রবিউল আউয়াল এর নয় তারিখ হয়েছে। তিনি দলীল সম্পর্কে যে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন তার সারাংশ এরূপঃ

১. সহীহ বুখারীতে আছে যে, দশম হিজরীতে যখন নবীজী ﷺ এর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে ইবরাহীম রা. ইন্তেকাল করেন তখন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। আর তখন নবীজী ﷺ এর বয়স ৬৩ বছর চলছিল।

২. গাণিতিক হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, দশম হিজরীর সেই সূর্য গ্রহণ খ্রিষ্টীয় ৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে হয়েছিল।

৩. চান্দ্র মাস হিসেবে এ সময় থেকে ৬৩ বছর পিছনে ফিরে গেলে দেখা যায় যে, নবীজী ﷺ এর জন্ম ৫৭১ সালে হয়ে ছিল। আর এ সময় রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ মোতাবেক ১২ই এপ্রিল হয়।

৪. জন্ম তারিখ সম্পর্কে যদিও মতভেদ রয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, নবীজী ﷺ এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবার হয়েছে। আর নির্ভরযোগ্য মতগুলো ৮-১২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৫. রবিউল আউয়াল এর ৮-১২ তারিখের মধ্যে সোমবার হয় নয় তারিখ। এসব কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নবীজী ﷺ এর জন্ম খ্রিষ্টীয় ৫৭১ সালের ২০শে এপ্রিল হয়েছিল। (সীরাতুন নবী ১/১১৭)

নবীজী ﷺ এর ইন্তেকালের তারিখ

ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে রবিউল আউয়াল এর বার তারিখ সোমবার, কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসের দুই তারিখ সোমবার আর কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নবীজী ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। প্রত্যেকেই নিজের দাবির পথে প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু বার ও দুই তারিখের পথে যে-সব দলীল পেশ করা হয়েছে তা আমাদের তাহকীক অনুযায়ী বিশুদ্ধ নয় কিংবা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই আমরা বার তারিখ এবং দুই তারিখের মতটি গ্রহণ করিনি। আমাদের তাহকীক অনুযায়ী নবীজী ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার ইন্তেকাল করেছেন। এক তারিখ সম্পর্কীয় দলীল নিম্নে পেশ করা হলোঃ

নবীজী ﷺ এর ইন্তেকালের ব্যাপারে যেসব বিষয়ে ইমামগণ একমত তা নিম্নরূপঃ

১. নবীজী ﷺ মৃত্যু বরণ করেন ১১ হিজরীতে।

২. রবিউল আউয়াল মাসে।

৩. সোমবার।

৪. এক তারিখ থেকে বার তারিখের মধ্যে মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সীরাতাজ্ঞ ও ইতিহাসবিদগণ এ সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করে থাকেনঃ এক, দুই ও বারই রবিউল আউয়াল। এই তিনটি মতকে সবরকম যাচাই বাছাইয়ের পর ১ম রবিউল আউয়াল এর মতটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসের মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত যে, اليوم اكملت لكم دينكم... শীর্ষক আয়াতটি দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছিল। (বুখারী, কিতাবুত তাফসীর) এই হিসাব ঠিক রেখে চান্দ্রমাসের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করলে রবিউল আউয়াল এর এক তারিখ সোমবার সাব্যস্ত হয়।

নিম্নে বিস্তারিত একটি নকশার মাধ্যমে একথা আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হলোঃ

নং	মাসের অবস্থা	রবিউল আউয়াল এর ১ম সোমবারের তারিখ	রবিউল আউয়াল এর ২য় সোমবারের তারিখ	রবিউল আউয়াল এর ৩য় সোমবারের তারিখ
১	যিলহজ্জ, মুহাররম, সফর সব ৩০শা	৬	১৩	২০
২	যিলহজ্জ, মুহাররম,	২	৯	১৬

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

	সফর সব ২৯শা			
৩	যিলহজ্জ, মুহাররম ২৯শা, সফর ৩০শা	১	৮	১৫
৪	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ও সফর ২৯শা	১	৮	১৫
৫	যিলহজ্জ ২৯শা, মুহাররম ৩০শা, সফর ২৯শা	১	৮	১৫
৬	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ২৯শা, সফর ৩০শা	৭	১৪	২১
৭	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ৩০শা, সফর ২৯শা	৭	১৪	২১
৮	যিলহজ্জ ২৯শা, মুহাররম ও সফর ৩০শা	৭	১৪	২১

এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ও ২১ তারিখ আলোচনার বাহিরে। কেননা এসব তারিখের কোনো প্রবক্তা নেই। (বি.দ্র. নকশায় দেখা যাচ্ছে যে, বার তারিখ কোনো ভাবেই সোমবার হচ্ছে না। তাই বার তারিখ সোমবার না হওয়া আরো স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল।) এখন রইল শুধু এক আর দুই তারিখ। আমরা নকশায় দেখতে পাচ্ছি যে, এক অবস্থায় দুই তারিখ সোমবার হতে পারে। অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটি মাসকে একাধারে উনত্রিশা ধরলে। আর জেনে রাখা উচিত যে, চান্দ্রমাস একাধারে তিনবার উনত্রিশা হওয়া চান্দ্রমাসের সাধারণ নিয়ম এর পরিপন্থী। তাই দুই তারিখের মতটি যুক্তিযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে উল্লেখিত তিনটি মাসের যেকোনো দুইটিকে উনত্রিশা ধরলে যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার হওয়া হিসেবে রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার হয়। আর স্বাভাবিকভাবেও চান্দ্রমাস পর পর দুই বার উনত্রিশা হয় কিংবা একটি উনত্রিশা এবং পরেরটি ত্রিশা হয়ে থাকে। অতএব যুক্তির সাথে সাথে হাফেজ মূসা ইবনে উকবা, লাইস বিন সাআদ, মুহাম্মদ বিন মূসা আলখাওয়ারেযমী প্রমুখ ইমামগণের উক্তি এক তারিখের মতকে সমর্থন করায় আমরা এক তারিখের মতটি গ্রহণ করছি। (সীরাতুন নবী ২/৪৭৭)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাছাড়া তাফসীরে তবারী ও তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইমাম ইবনে জুরাইজ তবারী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হল’ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হওয়ার দিন থেকে নিয়ে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত মোট একাশি দিন নবীজী ﷺ জীবিত ছিলেন।’ (তাফসীরে তবারী ৬/৯৬)

ইমাম ইবনে জুরাইজ এর এই উক্তি অনুযায়ীও উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার দিন থেকে নিয়ে একাশিতম দিন রবিউল আউয়াল এর এক তারিখ সোমবার হয়, যদি জিলহজ্জ, মুহাররাম ও সফর এই তিন মাসের যেকোনো দুইটিকে উনত্রিশা ধরা হয়। অতএব, রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার নবীজী ﷺ এর ইন্তেকাল হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মত। আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন। বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ (‘সীরাতুন নবী’ ২/৪৭৭)

রবিউস সানী মাসের করণীয় বর্জনীয়

রবিউস সানী মাসে বিশেষ কোন আমল না থাকলেও আমাদের দেশের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ ধর্মভীরু লোকেরা নিজের ইলমের অভাব এবং হক্কানী আলেমদের সাথে সম্পর্ক না থাকার দরুন এমন কিছু কাজ করে যা তাদের নজরে আমল মনে হলেও আসলে তা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। অথচ আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হবে (যদিও তা প্রথম অবস্থায় না হোক), কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। যথার্থ ঈমান ব্যতীত শুধু আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন সুরত নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে চরম ফিতনার যুগে অনেক মানুষ সকালে মু‘মিন থাকলেও বিকালে ঈমানহারা হচ্ছে, আবার কেউ বিকালে মু‘মিন থাকলেও সকালে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মানুষের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা সমাজে নেই। অথচ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দরুন এতদসম্পর্কিত অধিক সংখ্যক কিতাবপত্র রচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকা ছিল একান্ত জরুরী। তাই এই মাসে যে কাজের দ্বারা মানুষ তার ঈমানের ক্ষতি করছে তা উল্লেখ করে যথার্থ আমলের সুরত যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সুন্নত তরীকায় পুরো যিন্দেগী চলার তৌফিক দান করেন, আমীন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফাতিহা ইয়াযদাহম

ফাতিহা বলতে বোঝানো হয়, কোন মৃতের জন্য দু'আ করা, ঈসালে সওয়াব করা। ইয়াযদাহম ফার্সি শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মুতাবিক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ রবিউস সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবিউস সানীর ১১ তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতিহাখানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াযদহম।

ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরী'আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের অলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দু'আ করলে এবং জায়িয তরীকায় তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েজ ও বরকত লাভের ওসীলা হবে এবং তা সওয়াবের কাজ হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এর বিবরণ দেয়া হলোঃ

কবর যিয়ারত

হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সম্ভব হলে এটা করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে যখনই সুযোগ হয়, তখনই পিতা-মাতা ও অন্য মুরুব্বিদের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজ হয়। কবরে মাইয়্যিতকে দাফন করার পরও কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী বা সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা যায়। কবর যিয়ারতের নিয়ম এই যে, সম্ভব হলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে কবরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ মুর্দার চেহারামুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে কবরবাসীদের সালাম করবে। এরপর সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা কমপক্ষে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং দুরূদ শরীফ এগার বার পড়ে মুর্দার জন্য সাওয়াব রেসানী করবে। যদি ঐ অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে তাহলে হাত তুলতে পারে। এরপর আদবের সাথে কবরস্থান থেকে চলে আসবে এবং কবরবাসীদের থেকে নসীহত হাসিল করবে।

কবর পাকা করা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কবরকে পাকা করা বা কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও গুনাহের কাজ। সুতরাং কঠোরভাবে এর থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে গোরস্থানের চতুঃপার্শ্বে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া যায় বা কবরের চার পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কবরকে হেফাজত করা যায় এবং হেফাজত করা কর্তব্যও। যাতে গরু-ছাগল কবরের উপর চলাচল করে বা পেশাব-পায়খানা করে কবরের বেহুরমতী করতে না পারে।

ঈসালে সাওয়াবের তরীকা

মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাওয়াব রেসানী করা তাদের হক এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতগণ মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ব্যাপারে যতটুকু করবে, তারা মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয়দের থেকে সেরূপ আচরণ পাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে কিভাবে দু'আ করতে হবে, তার শব্দগুলোও শিখিয়েছেন এবং দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন; আর তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন। সুতরাং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানী করা খুবই দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে, 'মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহাজ তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে হাত মারতে থাকে এই ধারণায় যে, হাতে কোন কিছু আসে কি-না। যে আঁকড়ে ধরে সে জানে বাঁচাতে পারে। মুর্দারও সেই অবস্থাই হয় এবং সে জিবিতদের সাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। তখন তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যদি কিছু সাওয়াব রেসানী করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদের খেদমতে জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন'। (বাইহাকী, শুআবুল ঈমান হা নং- ৭৫২৭)

এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অনেকে না জানার কারণে সাওয়াব রেসানী অস্বীকার করে থাকে। এটা ভুল বরং সাওয়াব রেসানী সহীহ ও সুন্নত।

তবে সাওয়াব রেসানীর পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হওয়া উচিত। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে সাওয়াব রেসানী বাতিল বলে গণ্য হয় এবং মুর্দার কোন ফায়দা হয় না। এজন্য উচিত-মুর্দার নিজস্ব বা আপন লোকজন বন্ধু-বান্ধবগণ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ কুরআন শরীফ বা এর অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করে বখশে দিবে। বখশে দেয়ার জন্য আলাদা কোন মৌলবী সাহেবকে ডেকে আনা বা বলা জরুরী নয়; বরং প্রত্যেকে যদি তিলাওয়াতের আগে বা পরে নিয়ত করে নেয় যে, আমি

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যে তিলাওয়াত করছি হে আল্লাহ! এর সাওয়াব অমুক পাবে, তাহলে তিলাওয়াতের সাথে সাথে সেই মুর্দা বা যিন্দা যার নিয়ত করা হবে, তার আমলনামায় সাওয়াব পৌঁছে যাবে। নতুন করে সাওয়াব পৌঁছানোর দরকার নেই। বরং আত্মীয়-স্বজন কুরআন তিলাওয়াত করে ও সত্তর হাজার বার কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে সাওয়াব রেসানী করবে। তাছাড়া নিজেদের পয়সা থেকে সাওয়াব পৌঁছানো নিয়তে কিছু দান-খয়রাত করবে। যে কোন দিন সহজে সম্ভব হয় গরীব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবে এবং সারা বছর বরং সারা জীবন, যখন যেভাবে ও যতটুকু সম্ভব হয়, সাওয়াব রেসানী করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাদের জন্য দু'আ করবে। এটাই সহীহ পদ্ধতি।

সাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতিসমূহ

সাওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার যে প্রথা চালু হয়েছে, শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী এসব ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। মূর্খতার দরুন এসব বিদ'আত ও বদ রুসূম মুসলমানগণ ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছেন, অথচ এগুলো মারাত্মক গুনাহ। অনেকের এ ধরনের গুনাহ থেকে তওবা নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। সারা বছর বাপ-মায়ের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে থাকবে। একদিন যদি একটু বেশী করতে মনে চায় তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে করবে না। অন্য যে কোন দিন করবে এবং জরুরী মনে করবে না।

সাওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে ত্রিশা, চল্লিশা বা মৃত্যুর তিন দিন পর, নয় দিন পর অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মিলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায়। এটা ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা। মুর্দাকে কবরে রাখার পরবর্তী মুহূর্ত হতেই সে সন্তানাদি বা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। আর আত্মীয়দের পক্ষ চায় ত্রিশ দিন বা চল্লিশা দিন পর তা পাঠাতে। কত বড় নির্বুদ্ধিতা! কারো পিতা যদি জেলে চলে যায় তকে কোন আহমক ছেলে আছে কি, যে চল্লিশা দিন পরে পিতাকে জেল থেকে বের করার তদবীর শুরু করে? সুতরাং ত্রিশা-চল্লিশা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। অনেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী করে অথবা এমনিতেই হাদিয়া বলে তিলাওয়াতকারীদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম ও নাজায়িয। এতে তারাও গুনাহগার হয়, পড়নেওয়ালাও গুনাহগার হয় এবং হারাম পয়সা গ্রহণ করে। আর মুর্দার আমলনামায় কিছুই পৌঁছে না। কারণ, এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হল প্রথমে পড়নেওয়ালা সাওয়াব পায়, তারপর তিনি যার জন্য বখশে দেন, সে ব্যক্তি পায়। আর পড়নেওয়ালা যদি বিনিময়

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গ্রহণের আশায় পড়ে বা বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে গলদ নিয়তের কারণে সে নিজেই কোন সাওয়াব পেল না, তাহলে মুর্দাকে কী বখশে দিল? তার কাছে তো কোন সাওয়াবই নেই। সুতরাং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং ধোঁকা ও প্রতারণায় শামিল। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে, মুর্দা বাপ-মায়ের আমলনামায় কিছুই পৌঁছেনি। তখন বুঝে শুনে এভাবে যারা হারাম পয়সা গ্রহণ করেছে, তাদের চরম বেইজ্জতী হবে। সুতরাং নিজেরাই যতটুকু পারে, পড়ে দিবে। তিন বার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়। এটা পড়ে দিবে বা এমন আলেম দ্বারা পড়াবে-যারা সাওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করবেন না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে, আলেম-উলামাদের সঙ্গে তা'আল্লুক কায়েম করবে এবং সর্বদা যাতায়াত ও সুসম্পর্ক রাখবে। তাহলে তার বা তার আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সেই আলেমগণের দু'আ তিলাওয়াত অবশ্যই পাবে ইনশাআল্লাহ। খবরদার! অনর্থক রুসূম পালন করবে না। কারণ, তাতে কোন ফায়দা তো নেই-ই; বরং হারাম পন্থায় পয়সা দেয়ার কারণে গুনাহগারও হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য, রোগ-ব্যাধি ভাল হওয়ার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টা জায়েয, এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে সাওয়াব রেসানীর খতমের বিনিময়কে জায়েয বলা, হারাম বিষয়কে হালালে পরিণত করার হারাম অপচেষ্টা ও মহাপাপ।

সাওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে-মিসকীনদের খানা খাওয়ানো। অনেকে মাইয়্যিতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এক্ষেত্রে সকল ওয়ারিশ যদি বালেগ হয় এবং সকলের পরামর্শে বা অনুমতিতে যদি তা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিশও যদি নাবালেগ বা পাগল থাকে, তাহলে এরূপ করা নাজয়েয হবে এবং এই খানা খাওয়াও নাজায়েয হবে। এর দ্বারা এতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে যদিও ঐ নাবালেগ অনুমতি দেয়। কেননা শরী'আতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উত্তম পদ্ধতি হলো-বালেগ-ওয়ারিশগণ নিজস্ব সম্পদ থেকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াবেন।

সাওয়াব রেসানীর প্রচলিত আরেকটি বদ রুসূম

মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো সাওয়াব রেসানীর আরেকটি বদ রুসূম। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলো হারাম কাজ পাওয়া যায়। যেমন, রিয়াকারী বা লোক দেখানো ও সুনাম ছড়ানো উদ্দেশ্য না হলে মাইকে পড়ার দরকার কি? আল্লাহ তো আর বধির নন। তাছাড়া গ্রামবাসীও তো তার নিকট

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মাইকে কুরআন শুনানোর দরখাস্ত করেনি। তাহলে নাম কামানো ছাড়া আর কি ফায়দা থাকতে পারে? এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা সারা রাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মহা সমস্যায় ফেলা হয়। আশে পাশের লোকজন অস্থির হয়ে যায়। অথচ শরী'আতে কাউকে সমস্যায় ফেলার ইজাযত নেই। তেমনি ভাবে এর দ্বারা রাত্রে যারা যিকির-আযকার ও তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের ইবাদত-বন্দেগী নষ্ট করা হয়। এভাবে অনেকগুলো হারামের সমষ্টির নাম হচ্ছে প্রচলিত শবীনা। তারপর যদি অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েক গুণ বেশী হয়ে যায়। এরপর এসব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে সাওয়াব মনে করা আরেকটি হারাম এবং ঈমানের জন্য তা মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। আর এতসব হারামকে সাওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কত বড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব রুসূম বন্ধ করা একান্ত জরুরী। তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, কোথাও জায়েয পন্থায় সহীহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয় এবং পড়নেওয়ালার আওয়াজ তাদের সকলের নিকট পৌঁছতে মাইকের প্রয়োজন হয় এবং এমন সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয় যার আওয়াজ উক্ত মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, আর তাতে লোকদের অসুবিধা না হয়, তাহলে এ ধরণের ব্যবস্থা করতে কোন অসুবিধা নেই।

সাওয়াব রেসানীর আরেকটি গলদ প্রথা

প্রচলিত পদ্ধতিতে মিলাদ পড়ানো আরেকটি গলদ প্রথা। যার মধ্যে সূরা-কিরা'আত তেমন কিছু পড়া হয় না, নবী ﷺ-এর সুন্নতেরও কোন আলোচনা হয় না, বরং (ক) কিছু আরবী-ফার্সী বাংলা কবিতা গাওয়া হয়। (খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরী'আতে নেই। (গ) এরপর দরূদের নামে 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়, অথচ এটা কোন দুরূদ নয়। নবী ﷺ উম্মতের জন্য বহু দুরূদ রেখে গেছেন যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দুরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয়, এর শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকরণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোও ব্যাখ্যা কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লেখিত তিনটি গলদের সমষ্টির নাম হচ্ছে মিলাদ বা মৌলূদ শরীফ। এতে সাওয়াব হওয়ার মত কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা সাওয়াবের কাজ মনে করে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে মূর্খতার চরম সীমায় পৌঁছার কারণেই এ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে।

তবে কেউ যদি সহীহভাবে মীলাদ বা দু'আ করতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল-কুরআনে কারীম থেকে সূরা ইখলাস বা সূরা ইয়াসীন বা অন্য কোন সূরা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তিলাওয়াত করবে। নবী ﷺ-এর সুন্নত (যা তাঁর দুনিয়ায় আগমনের এবং মিলাদের প্রধান উদ্দেশ্য তার) থেকে কিছু বর্ণনা করবে এবং সহীহ হাদীসে যে সব দুরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে যেটা সহজ মনে করা হয় প্রত্যেকে নিজস্ব ভাবে এগার বার বা কমবেশী পড়ে নিবে। এরপর উপস্থিত লোকেরা মিলে দু'আ করে নিবে। এরূপ মিলাদ যদি সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্য পড়ানো হয়, তাহলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আর যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য পড়ানো হয়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ ও লেন-দেন করতে অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য, সাওয়াব রেসানীর লক্ষ্যে এলান করা, লোকজন একত্র হওয়া, শোকসভা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। মৃত্যু সংবাদ জানার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে নিজের স্থানে থেকে যতটুকু সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করে বা তিন বার সূরা ইখলাস পড়ে সাওয়াব রেসানী করে দিবে। এটাই সহীহ তরীকা।

তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, কোথাও জায়েয কোন উদ্দেশ্য লোকজন জমা হয়েছে, যেমন: ওয়াজ মাহফিলে বা মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক এমনিতেই উপস্থিত থাকেন। তারা কোন সময় বা নামাযের পর মুর্দার জন্য দু'আ করে দিলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহীহ আমল সহীহভাবে করার তৌফিক দান করেন।

জুমাদাল উলা মাসের করণীয় বর্জনীয়

মুসলমান আমল থেকে কখনো খালি থাকে না। প্রতিটি মূহুর্ত তার আমলে কাটে। একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় আমল হলো মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকা। সময়ের দিকে লক্ষ্য করে এই মাসে বিশেষ কোন আমল না থাকায় মুমিনের সবচেয়ে মূলবান জিনিস ঈমান-আক্বীদার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

তাওহীদ-রিসালাতের হাকীকত ও তাৎপর্য

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তরজমা; হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তার সাথীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদেরে মাঝে পরস্পর সহানুভূতিশীল। (সুরা ফাতহ:২৯)

বর্ণিত আয়াত হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও বাহ্যিক ভাবে বিজয়ের কোন চিহ্ন তাতে বিদ্যমান ছিল না। যে কারণে হযরত উমর ফারুক রাযি. সহ অন্যান্য সাহাবীগণ এ সন্ধির ব্যাপারে খুবই পেরেশান ছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ সন্ধির অনেক হেকমত প্রকাশ করলেন। সুলহে হুদাইবিয়ার পরপরই খাইবার বিজয় হয়ে গেলো। প্রচুর গনীমত মুসলমানদের হাতে এসে এতদিনের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অপর দিকে ইয়াহুদী জাতি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলো এবং সময়ের ব্যবধানে মক্কা বিজয় হয়ে চরম ও পরম লক্ষ্য অর্জিত হলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র প্রস্তুতকালে কাফেরদের অযৌক্তিক শর্ত

সুলাহনামা (সন্ধিপত্র) প্রস্তুতলগ্নে মক্কায় কাফেরদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত কার্য ও অযৌক্তিক শর্ত উত্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে তাদের দু'একটি উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ হলো সুলাহানামার শুরুতে হযরত আলী রাযি. 'বিসমিল্লাহ' শরীফ লিখেছিলেন। কিন্তু কাফেররা তা মানলো না। তারা বরং বলে বসলো-রহমান কে? তাকে আমরা চিনি না। সুতরাং আমাদের নিয়ম মতো "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখতে হবে। মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে তাই লেখা হলো। তারপর হযরত আলী রাযি. লিখলেন-এটা একটি চুক্তিনামা, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের সাথে সম্পাদন করলেন। কাফেররা এতে আপত্তি করে বসলো যে, মুহাম্মাদ ﷺ কে যদি আমারা আল্লাহর রাসূল মেনেই নেই, তাহলে তার সাথে আমাদের বিবাদ কিসের? তাহলে তো সমস্ত ঝগড়ার অবসান হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত রাসূলুল্লাহ শব্দের স্থলে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখতে হবে।

এ দাবি নিয়ে তারা খুবই পীড়াপীড়ি ও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো। তখন মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে তাদের দাবি মেনে নিয়ে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেলা হলো এবং তদস্থলে "বিন আব্দুল্লাহ" লেখা হলো। দ্বীনের স্বার্থে মহানবী ﷺ-এর বিনয় ও নম্রতার এই প্রকাশ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমাদৃত হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান [যে ব্যাক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন] অনুযায়ী এ আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে মহানবী

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ﷺ-এর নামের সাথে রাসূলুল্লাহ শব্দ নাযিল করে চিরস্থায়ী করে দিলেন-যা কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক লিখিত ও পঠিত হতে থাকবে।

মুহাম্মাদ নামের সার্থকতা

মহানবী ﷺকে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে 'মুহাম্মাদ' নামটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নামটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকের চার স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং এ নামটি নবী ﷺ-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর দাদা খাজা আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। আর এ নামের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হবে হাশরের ময়দানে। নবীজী ﷺ যখন সকল মানুষের জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে মাকামে মাহমূদে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেই সুপারিশ কবুল করে হিসাব শুরু করবেন। ইতিপূর্বে সব মানুষ সকল বড় বড় রাসূল আ. গণের দরবারে গিয়ে ফিরে আসবে, কেউ তাদের সুপারিশের যিম্মাদারী নিতে সাহস করবেন না, ঠিক এমনই মুহূর্তে মহানবী ﷺ শাফা'আতের যিম্মাদারী গ্রহণ করায় এবং শাফা'আত করায় দুনিয়ার শুরুলগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষের দুনিয়াতে আবির্ভাব ঘটেছে, সকলে একবাক্যে নবীজী ﷺ-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। তখন মুহাম্মাদ অর্থাৎ প্রশংসিত নামের পূর্ণপ্রকাশ ঘটবে। মহানবী ﷺ-এর আরেক নাম 'আহমাদ' অর্থ- সকলের চেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। বাস্তবিক পক্ষে তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য সবচেয়ে বেশী কুরবানী করেছেন এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করেছেন। তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার এই বিধান বাস্তবায়িত হবে যে, দুনিয়াতে যে যত বেশী আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে, তার দ্বীনের জন্য যত বেশী কুরবানী করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে ততবেশী প্রশংসিত ও মর্যাদাশীল করবেন। তায়েফের জুলুম ও অত্যাচারের পরক্ষণেই মিরাজে আল্লাহ তা'আলার দীদার ও সান্নিধ্য লাভ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কুরবানী, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-তাকলীফ বরদাশত ইত্যাদিও কড়া-ক্রান্তি হিসাব রাখেন এবং বান্দাকে সেই অনুপাতে বরং তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

কালিমা তাইয়্যেবা ও তার দাবি

আয়াতের প্রথম অংশটুকু কালিমায়ে তাইয়্যেবা ["লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"]-এর দ্বিতীয় অংশ বটে। আর কালিমা তাইয়্যেবার প্রথমাংশও বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রথমাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়ে যাই যে, আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয় বা অন্য কাউকে ইবাদত করার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্পষ্ট। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা। তিনিই আমাদের কল্যাণার্থে যা কিছু দরকার সব কিছুই সম্পন্ন করেছেন, দিয়েছেন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণের পরিপূর্ণ অধিকারী। কোন দোষ-ত্রুটি তাঁর ধাওে কাছে ঘেষতে পারেনা। তার ফয়সালা ব্যতীত অন্য কারো হাতে আমাদের উপকার বা অপকারের সামান্যতম ক্ষমতাও প্রদান করা হয়নি। সৃষ্টজীব দ্বারা বাহ্যিক ভাবে আমাদের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধিত হলে সেটা মূলত আমাদের কর্মফলের ভিত্তিতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মাখলুক ও সৃষ্টজীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তার ভিতরে যে ক্ষমতা বা তাছীর আমরা লক্ষ্য করি, তা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই দেয়া ক্ষমতা এবং সে ঐ ক্ষমতা প্রকাশ করতেও আল্লাহর হুকুমের মুখাপেক্ষী। এ কারণেই আগুনের জ্বালানোর ক্ষমতা সর্বক্ষণ জারী থাকা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম আ. কে আগুন জ্বালাতে পারেনি। বরং আরাম ও শান্তি দিয়েছিল। ধারালো ছুরির ভিতরে সব সময় কাটার ক্ষমতা লক্ষ্য করা গেলেও ঐ ছুরি ইসমাইল আ. কে কাটেনি। পানির ভিতরে ডুবানো ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বে ঐ পানি হযরত মূসা আ.-এর বাহিনীকে ডুবায়নি। সাহাবী হযরত আলা ইবনুল হাযরামী রাযি.-এর সেনাদলকে ডুবায়নি। এসবের একটাই কারণ, মাখলুক বা সৃষ্টজীব তার ক্ষমতা প্রকাশ করতে হলেও ক্ষমতাদানকারী আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের মুহতাজ হয়। তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করলে, কোন মাখলুকের কোন ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে না।

উপকার বা অপকার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ

এজন্য নবীয়ে কারীম ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে বললেন- হে ইবনে আব্বাস! সমগ্র দুনিয়ার মাখলুকাত যদি তোমার কোন কল্যাণ বা ক্ষতি করতে চায় অথচ আল্লাহ তা'আলা যদি না চান, তাহলে মাখলুক তোমার বিন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার উপকার বা ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত করেন তাহলে সমগ্র মাখলুক একত্র হয়ে তা বন্ধ করতে সক্ষম হবে না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপকার বা অপকার সাধনে কারো মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু মাখলুক কারো উপকার বা অপকার করতে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী।

শিরকে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিহীনতা

বিধর্মীরা কোন মাখলুকের মধ্যে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করলে তাকে দেবতা ভেবে তার পূজা শুরু করে দেয়। এটা একবারেই অনর্থক। বস্তুত তার ঐ ক্ষমতা নিজস্ব ক্ষমতা নয়, বরং খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাদাতা ও ক্ষমতাধরের ইবাদত না করে তাঁর অধীনস্থকে পূজা, ইবাদত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী হতে পারে? বস্তুত শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা প্রকাশ্য শিরক। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে- "তিনি সকল গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং তাওবাকারীর সকল গুনাহ মাফ করেও দেন, কিন্তু শিরককে তিনি কখনই ক্ষমা করবেন না।" (সুরায়ে নিসা-৪৮)

হ্যাঁ তারা যদি কালিমা পড়ে শিরক থেকে তাওবা করে নেয়, তাহলে অবশ্য তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক

উল্লেখ্য, বিধর্মীরা যেমন বিভিন্ন দেব-দেবীর ক্ষমতায় বিশ্বাসী, তেমনি ভাবে অনেক মুসলমানকেও দেখা যায় যে, তারা বিভিন্ন মাখলুকের ক্ষমতায় বিশ্বাসী। যেমন অনেকে নিজের পীরকে গায়েবজান্তা, মুশকিল কুশা, হাজতরাওয়া, প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করে! অনেকে মাযারবাসী বুযুর্গকে ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদাদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি বিশ্বাস করে। এসব বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই তারা মাযারে যায়, ওরস করে, শিরনী করে, গাড়ী থামিয়ে সেখানে পয়সা দেয়, পয়সা উঠায়, গরু-খাসী দেয়, কবরকে সিজদা করে, তাওয়াফ করে ইত্যাদি। অথচ এ সবই আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার করার শিরকী গুনাহ হয়-যা আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না বলে কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন।

আবার অনেক মানুষ নিজের ব্যবসা, নিজের জমি, নিজের মিল ফ্যাক্টরী, নিজের চাকুরী ইত্যাদিকে পরোক্ষ পালনেওয়ালা বা রিযিকদাতা বিশ্বাস করে, যদিও মুখে স্বীকার করে না। এসব আসবাব যখন হাত ছাড়া হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন তারা হা-হুতাশ করে, একবারেই ভেঙ্গে পড়ে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাদের গোমর ফাঁক হয়ে যায়। এতদিন তারা বলেছে- "জমি বা দোকান রিযিকদাতা নয়, বরং রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা" এটা একান্তই তাদের

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুখের কথা; দিলের বিশ্বাস নয়। নতুবা এত পেরেশানীর কী অর্থ থাকতে পারে? তার চাকুরী চলে গেছে, দোকান নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তো একই অবস্থায় আছেন। পেরেশানীর কি আছে? রুটি ও রুজির কোন সোর্স বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নতুন আরেকটা সোর্স চালু করে দিবেন। তিনি কি নির্দিষ্ট একটা সোর্সের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোর মুহতাজ? কখনো নয়। তিনি বনী ইসরাইলকে দুনিয়ার কোন প্রকার সোর্স ছাড়াই চল্লিশ বছর পর্যন্ত লালন-পালন করে জগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান সহীহ হয় এবং তারা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি এ ধরণের মজবুত বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমান এমনিই হাসিল হয় না। এর জন্য ঈমানী লাইনে মেহনত জরুরী। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেভাবে ঈমান ও আমালের দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে অটল ঈমানের ও মজবুত আমল হাসিল করেছিলেন, আমাদেরকেও সেই একই রাস্তা গ্রহণ করতে হবে। হযরত ইমাম মালিক রহ. বলতেন-এ উম্মতের শেষাংশ পরবর্তী লোকেরা ঐ জিনিসের মাধ্যমেই ইসলাহ ও কামিয়াবী অর্জন করতে পারবে, যে জিনিসের মাধ্যমে এ উম্মতের প্রথমাংশ অর্থাৎ সাহাবীগণ রাযি. কামিয়াবী অর্জন করেছিলেন। (ফাযায়েলে আমাল-১০০৩পৃষ্ঠা)

সকল যুগের লোকেরা যেহেতু ছোটবেলা থেকেই উপায়-উপকরণ ও আসবাবের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে, বস্তু জগতের তা'ছীর এবং বস্তু থেকে সব কিছু হয়-এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বড় হয়েছে-এতে করে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে এ গলত খেয়াল ও ভুল বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, চীজ ও আসবাব থেকেই সব কিছু হয় এবং বেশী বেশী মাল দৌলত, ধন-সম্পদ জমা করতে পারলেই ব্যক্তি সুখ শান্তি ও ইজ্জতের অধিকারী হয়ে যয়। আর বড় বড় পদ যেমন, রাজা-বাদশাহ, উজীর-নাজীর, মন্ত্রী-মিনিষ্টার হতে পারলে মহা সম্মানী হতে পারে। সে যত বড় হয়েছে, এ ভ্রান্ত ধারনা ততবেশী তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে। অথচ এটাই (ধনলিপ্সা ও পদলিপ্সা) দুনিয়া ও আখিরাতে একটা মানুষের ধ্বংসের মূল।

সফলতার পথ

এ কারণে যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা বান্দার নাজাত ও কল্যাণের জন্য যত নবী রাসূল আ. প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সকলের একই আহ্বান ছিল-

يَآاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْ-

'হে লোক সকল! তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করো, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হবে।' একথার সারমর্ম এটাই যে, এক

আল্লাহ থেকে সব কিছু হয়, চীজ ও আসবাবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বরং তারা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মুহতাজ। সুতরাং ধন-সম্পদ ও বড় বড় পদ মানুষকে সুখ-শান্তি ইজ্জত-সম্মান কিছুই দিতে পারে না। এগুলোর মধ্যে কামিয়াবী নিহিত মনে করা মারাত্মক ধোঁকা ও সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী।

নবীগণের আ. মূল দাওয়াত

যুগ যুগ ধরে যে গলত খেয়াল ও ভুল বিশ্বাস মানুষেরা দিলের মধ্যে লালন করে এসেছে, নবী রাসূলগণ আ. সর্ব প্রথম সেখানেই কুঠারাঘাত করেছেন এবং সে ভ্রান্ত ধারণার বেড়াজাল থেকে মানুষকে উদ্ধার করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। চীজ ও আসবাব থেকে তাদের ঈমান ও ইয়াকীনকে হটিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাঁদের দাওয়াতে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছেন যে, আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ভুল ছিলো। বস্তুত মাখলুকের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ

সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কারণে তাঁরা ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীর জন্য রাস্তা করে দিতে বলেছেন নদীকে। মিসরের নীল দরিয়ার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন-যাতে করে সে কোন যুবতীকে তার বক্ষে ডুবানো ছাড়াই আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়। তাঁদের অবস্থানের জন্য জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারদেরকে জঙ্গল খালী করে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বাঘের মুখে থাপ্পড় মেরে পথিকদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে বলেছেন। বিষের সম্পূর্ণ বোতল খেয়ে ফেলেছেন। এ ধরণের হাজারো ঘটনা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আল্লাহওয়ালারা যখন খোদায়ী শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েছেন, তখন মাখলুককে এভাবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন।

তাওহীদের মর্মকথা

প্রত্যেক মানুষের উপর ফরজ, চীজ ও আসবাবের ইয়াকীন দিল থেকে বের করে সব কিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হওয়ার ইয়াকীন দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেয়া। এটার নামই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। কবরে সর্ব প্রথম এ তাওহীদের ব্যাপারেই প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্নের জওয়াবে যারা কামিয়াব হবেন, তারা সামনের সকল ঘাঁটি সহজেই পার হয়ে যাবেন। কারণ, মৃত্যু পরবর্তী যিন্দেগীর সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ কঠিন ঘাঁটি হচ্ছে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কবর। এ ঘাঁটিতে কামিয়াব হওয়ার অর্থই হচ্ছে সম্মুখের সকল ঘাঁটিতে কামিয়াব হওয়া।

খাঁটি ঈমানের হাকীকত

শুধু মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়ার নাম সহীহ ঈমান নয়। বরং অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝে শুনে আমলে পরিবর্তন এনে খোদায়ী শক্তির উপর ঈমান আনার নাম সহীহ ঈমান ও খালিস তাওহীদ। এ কারণেই মক্কার কাফিররা আমাদের থেকে সুন্দর করে পড়তে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এ কালিমা পড়তে তারা রাজী হতো না।

তারা জানতো যে, এ কালিমা শুধু পড়লে চলবে না। বরং বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর তারা বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে বিশ্বাসের পরিবর্তন করতে রাজী ছিলো না। এই হলো কালিমার প্রথমাংশের সার সংক্ষেপ।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে-"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" যা আমাদের আলোচিত তাফসীরের মূল আয়াত।

কালিমার দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য

আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য হলো- প্রথমাংশে যে ওয়াদা ও স্বীকারোক্তি করা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তার বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়েছে- ইবাদত একমাত্র আল্লাহ ত'আলার জন্যই করতে হবে। ইবাদত করার অর্থ হচ্ছে- সেগুলো কিভাবে মেনে চলতে হবে? তার ব্যাখ্যা কি হবে? এবং তার বাস্তব নমুনা কিরূপ হবে?

সে প্রশ্নের উত্তরই হলো এ দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ব্যাখ্যা ও তার বাস্তব নমুনা, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।" তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তেইশ বছরের জীবনে যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তা সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নামায কত ওয়াক্ত, কত রাকাআত এবং পড়ার পদ্ধতি কি? তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে নবী ﷺ-এর সুন্নতের ওপর। নবী ﷺ-এর সুন্নত ও হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা কালিমার উপরে আমল করার দুনিয়াতে কোন পথ নাই। কালিমার দ্বিতীয় অংশের সারকথা এটাই যে, একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরীকার মধ্যেই কামিয়াবী এবং শান্তি নিহিত রয়েছে। এর বাইরে দুনিয়াতে যত তরীকা বা তন্ত্র-

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মন্ত আছে, তার কোনটার মধ্যে শান্তি ও কামিয়াবী নেই। বরং এসবই অচল। কিছুদিনের মধ্যে এগুলোর অসারতা প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয়তঃ এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হাদীস ও সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও তাফসীর। এটাকে বাদ দিয়ে দ্বীনের ওপর চলার কোন রাস্তা নেই।

আল্লাহ আমাদের বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন

জুমাদাল উখরা মাসের করণীয় বর্জনীয়

আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। যদিও আমরা তাঁর গুনাহগার বান্দা এবং আল্লাহ পাক মাহাত্ম্য ও বড়ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত। আর বান্দা এত নিম্নস্তরে যে, আল্লাহ পাকের সাথে তার কোন তুলনাই হয় না। তারপরও তিনি দয়া-পরবশ হয়ে আমাদেরকে এমন পথ প্রদর্শন করেছেন যে, তা অনুসরণ করে আমরা তাঁর ওলী ও বন্ধুতে পরিণত হতে পারি। বান্দাকে এতটা উপরে উঠিয়ে আনার জন্য তিনি দান করেছেন আসমানী কিতাব, প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসূল আ. এবং আমাদের জন্য আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ- এর অনুকরণের মধ্যে এ দৌলত লুকায়িত রেখেছেন।

মানুষ আল্লাহ পাকের দাস। সে হিসেবে তাদের কোন মর্যাদা থাকারই কথা নয়। কিন্তু যখন সে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও রাসূলে আকরাম ﷺ- এর পুরোপুরি অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এ পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক তাকে দাসত্বের স্তর থেকে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

একটি উদাহরণ

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে বলে আশা করি। যেমন, কোন ব্যক্তি একটি ফ্যাক্টরীর বেতনভোগী কর্মচারী। একদিন ফ্যাক্টরীর মালিক তার কর্মে খুশী হয়ে তাকে বললেন, একই গাড়ীতে আরোহণ করবে, আমার সঙ্গে মিল ফ্যাক্টরীর দেখাশোনা করবে। তাছাড়া তোমার নির্ধারিত কোন বেতন নেই। যখন যা প্রয়োজন, তাই চেয়ে নিয়ে খরচ করবে। মালিকের এরূপ আচরণে সত্যিই উক্ত কর্মচারী তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়বে এবং এটাই স্বাভাবিক।

তাই প্রতি মাসের করণীয় বর্জনীয় আমলের প্রতি লক্ষ্য করার সাথে আমাদের প্রতি মূহুর্তের করণীয় বর্জনীয় আমলের প্রতি খেয়াল রাখা বেশী জরুরী। কেননা মাসের আমল একটা ক্ষুদ্র সময় ব্যাপী হয়ে থাকে অথচ মোমিনের ফিকিরতো

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এটাই যে সে প্রতি মূহুর্তে আল্লাহর অলী হওয়ার ফিকির করে। তাই আল্লাহর গোলাম থেকে কিভাবে আমরা আল্লাহর অলী হতে পারি তার একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি সহ দৈনন্দিন কিছু আমলের কথা উল্লেখ করা হলো যা দ্বারা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল সহজ হবে।

সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য জরুরী

উভয় জগতে কামিয়াবীর জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের সাথে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা রাখা জরুরী। আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া এবং হেদায়েতের উপর কায়েম থাকার জন্য আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত অপরিহার্য বিষয়। (সুরায়ে তাওবা ১১৯, সূরায়ে নাহল ৪৩)

দীনের খেদমতে নিয়োজিত উলামায়ে কেরামের কখনো সমালোচনা করবে না। এতে নিজের দীন ও ঈমানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। হ্যাঁ, তাদের কোন ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, তারা তো আর ফেরেশতা নন। তবে তাদের মুরব্বীগণ তাদের সে সব ভুলের সংশোধন করবেন। এটা অন্যদের দায়িত্ব নয়। অধুনা অনেকে উলামায়ে কেরামের ভুল ধরে এবং একা একা গবেষণা করে বা আল্লাহওয়ালাদের সোহবত বঞ্চিত ইসলামী চিন্তাবিদদের অনুসরণ করে দীনদার হতে চায়। এটা গোমরাহী ও দোযখের রাস্তা। তাই এ পথ কখনো অবলম্বন করবে না।

নিঃস্বার্থ ও হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে নিচের কাজগুলো সারাজীবন আনজাম দিতে হবেঃ

ক. ঈমানী বিষয়ের তা'লীমের মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আক্বীদা বিশ্বাসকে সঠিক করতে হবে এবং ঈমানকে কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস থেকে হেফাজত করতে হবে এবং ঈমানী দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত ও পোক্তা করতে হবে। (সূরায়ে নিসা ১১৫, সূরায়ে বাকারা ১৩)

খ. ইবাদাত তথা নামায, রোযা, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ সুন্নাত মুতাবিক সুন্দরভাবে করতে হবে। এর জন্য হক্কানী আলেমদের মজলিসে শরীক হয়ে নামায ও অন্যান্য আমলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। (সূরায়ে আলে ইমরান ৩১, তিরমিযী ২৬৭৮, মুয়াত্তা মালেক ৪৩৩)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

গ. মু'আমালাত তথা হালাল রিযিকের পাবন্দী করবে। সুতরাং ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, কৃষিজীবীসহ সকল স্তরের উপার্জনকারী স্ব-স্ব পেশার হালাল-হারাম কোন হক্কানী মুফতী থেকে ভালভাবে জেনে নিবে। কারো ইনতিকাল হলে মীরাছ বণ্টনে দেরী করবে না, তার কোন ইয়াতীম বাচ্চা থাকলে তার অংশ খুব হেফাজত করবে, তার মাল খাওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকবে। হালাল রিযিক ইবাদতের দিকে ধাবিত করে আর হারাম রিযিক গোনাহের দিকে ধাবিত করে। (সূরায়ে মুমিনূন-৫১, সূরায়ে বাকারাহ-১৬৮)

ঘ. মু'আশারাত তথা বান্দার হক বিশেষ করে পিতা-মাতা, বিবি বাচ্চা ও অন্যান্যদের হক হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। কারো হক নষ্ট করবে না। কাউকে অনর্থক কষ্ট দিবে না। এমনকি জীব-জন্তুকে কষ্ট দেয়া থেকেও বিরত থাকবে। নিজের হক উসুলের তুলনায় অন্যের হক আদায় করাকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহর হক আল্লাহ হয়তো মাফ করে দিবেন কিন্তু বান্দার হক তিনি মাফ করবেন না। হাশরের ময়দানে পাওনাদারকে নেকী দিতে হবে কিংবা তার গোনাহের বোঝা বহন করতে হবে। (সূরায়ে নিসা ৩৬, বুখারী শরীফ ৬৪৮৪)

ঙ. তাযকিয়াহ তথা আত্মশুদ্ধির ফিকির রাখবে। কুরআনে কারীমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে যত কসম ব্যবহৃত হয়েছে অন্য কোন হুকুমের ব্যাপারে তা হয়নি। সুতরাং অন্তরের দশটি মন্দ স্বভাব তথা আধ্যাত্মিক রোগ বা গুনাহ সংশোধনের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ পরিত্যাগ করার জন্য এবং অন্তরের দশটি ভাল স্বভাব অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কোন আল্লাহওয়ালা শাইখের সাথে সরাসরি অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ইসলাহী সম্পর্ক রাখাকে ফরয মনে করবে। এবং সুযোগমত তাদের মজলিসে বসতে চেষ্টা করবে। (সূরায়ে শামস-৯-১০, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ১৫৯৯)

* এই পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন এবং এ পাঁচ বিষয়ের উপর আমলকারীকে মুত্তাকী বা আল্লাহওয়ালা বলা হয় এবং প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহওয়ালা হওয়া ফরয। (বাকারা-১৭৭)

আল্লাহর দীনের জন্য সময় ফারেগ করা

উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার লক্ষ্যে সারা জীবন দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াহ-এই তিন প্রকার মেহনতের জন্য সময় বের করবে। এর যেকোন একটির জন্য মেহনত করাকে যথেষ্ট মনে করবে না। এ তিনটির ব্যাখ্যা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিবে। (বাকারা-১২৯, আলে ইমরান-১৬৪)

দৈনন্দিন আমল

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। জামা'আতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব। জামা'আত তরককারী ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। তাহাজ্জুদ সহ অন্যান্য নফল নামায পড়বে। মহিলাদের জন্য বিনা উযরে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হওয়া নাজায়িয ও গুনাহ। (বাকারা-৪২, বুখারী-৯৬)

গুনাহ বর্জন

শিরক বিদ'আত ও গুনাহ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে। একটি গুনাহই মানুষকে দোযখে নিয়ে যেতে পারে। নেক কাজ দুধের মত আর গুনাহ হল বিষের মত। উভয়টি একত্রিত হলে বিষের ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। (আনআম-১২০, মিশকাত-২২৮)

সুন্নাতের অনুসরণ

প্রতিটি কাজ নবীজীর ﷺ সুন্নাত অনুযায়ী করার জন্য সুন্নাত শিখতে থাকবে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণ নিবে এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সহজ সুন্নাতকে (তথাঃ ক. পরস্পর সালাম আদান প্রদান। খ. উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলা। নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ বলা। সমতলে চলতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করা। গ. প্রত্যেক ভাল কাজে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া। নিম্ন মানের কাজে বামকে প্রাধান্য দেওয়া) আমলে আনবে। যাতে করে অবশিষ্ট সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। (আলে ইমরান-৩১)

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

কুরআনে কারীমের সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াত করবে। এটা ফরয। সূরা কিরা'আত অশুদ্ধ তিলাওয়াত করা বড়ই আফসোসের বিষয়। ফরয তরককারী কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না। প্রতিদিন এক পারা করে কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করবে। এজন্যই কুরআনকে ত্রিশ পারায় বিভক্ত করা হয়েছে। যারা হাফেয তারা তিন পারা করে তিলাওয়াত করবে। তবে সাধারণ অবস্থায় সাত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দিন বা তিন দিনের কমে খতম করবে না। কেননা, হাদীস শরীফে তাড়াহুড়া করে খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাদ ফজর সূরায়ে ইয়াসীন, বাদ মাগরিব সূরায়ে ওয়াক্বিয়াহ ও শোয়ার পূর্বে সূরায়ে মুলক তিলাওয়াত করবে। (আবু দাউদ-১৩৮৮)

ফরয নামাযের পরে ওজীফা পড়বে

প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তিনবার ইস্তিগফার পড়বে। (তাবারানী কাবীর-৮৫৪১)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

এবং এ দু'আটি পড়লেও ভাল হয়। (বুখারী শরীফ-১/১১৭)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

আরো কিছু দু'আ কালাম আছে যা ফরযের পর সুন্নাত ও নফল থাকলে, সুন্নাত ও নফলের পরে পড়বে। আর সুন্নাত নফল না থাকলে ফরযের পরে পড়বে।

(ক) আয়াতুল কুরসী, একবার। (নাসাঈ-৯৮৪৮)

(খ) সূরা ফালাক, সূরা নাস-তিনবার করে, এর সাথে সূরায়ে কাফিরুন ও ইখলাস মিলিয়ে নিলে ভাল। (তিরমিযী-২৯০৩)

(গ) তাসবীহে ফাতেমী একবার। (৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ, ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ) (মুসলিম ৫৯৭)

এগুলো পাঁচ ওয়াক্তেই পড়বে। শুধু ফজর ও মাগরিবে এ তিনটির আগে নিচের দুটি পড়বে।

(ঘ) اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

(ঙ) ফজর ও মাগরিবের পর পড়বে-৩ বার

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পড়ে, বিসমিল্লাহ পড়ার পর ১ বার سورة الحشر এর শেষ ৩ আয়াত পড়বে। (তিরমিযী, ২:১২০)

বিঃদ্রঃ হাদীসে আরো কিছু দু'আ আছে, সুযোগ হলে সেগুলোও পড়বে। জুমু'আর দিন আসরের পরে এই দুরুদটি ৮০ বার পড়বে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسلم تَسْلِيمًا

* তাছাড়া প্রতিদিন যে কোন সময় একশবার দুরূদ শরীফ পড়বে। (আদদুররুল মানদূদ-১৬০)

* প্রতিদিন মুনাজাতে মকবূল থেকে এক মনযিল পাঠ করতে চেষ্টা করবে।

* আল্লাহ তা'আলার যিকির করবে
* তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে অথবা যখন সুযোগ হয় আসন দিয়ে বসবে। তারপরে কয়েকবার ইস্তিগফার ও কয়েকবার সহীহ দুরূদ শরীফ পড়বে। (ইবনে হিব্বান-৮১৭)

* তারপরে কসদুস সাবীলের বর্ণনা অনুযায়ী যিকির করবে। যিকিরের সময় শরীর সামান্য হেলাবে। যথেষ্ট পরিমাণ সময় না পেলে বা অন্য কোন সমস্যা হলে বার তাসবীহ এর যিকির করবে।

*** বার তাসবীহ এর যিকিরের বিবরণ**

- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পূর্ণ কালেমা)
- ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার। (প্রত্যেকটায় একবার পরে শ্বাস ফেলবে।)
- আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার। (প্রথমটার শেষে পেশ।)
- আল্লাহ ১০০ বার। (শেষে সাকিন।)

রজব মাসের করণীয় বর্জনীয়

রজব মাসের বিশেষ আমল হিসেবে আমাদের দেশে যা প্রচলন আছে তা হলো শবে মি'রাজ। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাপারে যে হুকুম-আহকাম রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শরী'আতের দৃষ্টিতে শবে মি'রাজ

মি'রাজ আরবী উরুজ শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ ঊর্ধ্বে গমন করা। আর মি'রাজ শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণের বাহন। মি'রাজের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিলো এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে নির্ভর যোগ্য সূত্রে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় যে, মি'রাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মাস, দিন তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। যদিও সাধারণ জনগণের মাঝে প্রসিদ্ধ হলো রজব মাসের ২৭ তম তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ ও শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ খঃ৮ পৃঃ ১৮/১৯)

পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রে ভ্রমণকে ইসরা ও তথা হতে সিদরাতুলমুনতাহা ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: পবিত্র ঐ মহান সত্ত্বা যিনি রাত্রি বেলায় তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি। এটা এজন্য যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি। (সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং-১)

হাদীসের আলোকে মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

একদা রাতে রাসূল ﷺ হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘরে শুয়েছিলেন। রাসূলের অর্ধনিদ্রা অবস্থায় হযরত জিবরীল আ. অন্যান্য ফেরেশতাসহ অবতরণ করেন এবং হুযুর ﷺ কে মসজিদে হারামে নিয়ে যান। রাসূল ﷺ তখন হাতীমে কা'বায় ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত জিবরীল ও মীকাঈল আ. নবী ﷺ কে জাগিয়ে যমযমের পাশে নিয়ে সীনা মুবারক বিদীর্ণ করে অন্তরাত্মা বের করে যমযমের পানিতে ধুয়ে ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ করে স্বর্ণের তশতরীতে রাখেন। অতঃপর পুনরায় বক্ষে স্থাপন করে দেন। এরপর বোরাক নামক বাহনে করে হুযুর ﷺ কে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমানে নিয়ে যান। প্রথম আসমানের নিকট গিয়ে জিবরীল আ. দরজা খোলার আবেদন জানান।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফেরেশতাগণ অভিবাদন জানিয়ে রাসূল ﷺ কে বরণ করে নেন। এভাবে সপ্তম আসমান অতিক্রম করেন। এসময়ে যথাক্রমে প্রথম আসমানে হযরত আদম আ., দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া এবং ঈসা আ. তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আ. চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস আ. পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আ. ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আ. সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলেই হুযুর ﷺকে অভ্যর্থনা জানান। সপ্তমাকাশ থেকে রাসূল ﷺ রফরফ নামক বাহনের মাধ্যমে সিদরাতুলমুনতাহা ও আরশে আযীমে গমন করেন। সেখানে অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। জান্নাত জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখেন। পরিশেষে আল্লাহর দীদার ও কালাম লাভে ধন্য হন। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের বিধান নিয়ে জমিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে হযরত মূসা আ. এর পরামর্শক্রমে কয়েকবার আল্লাহর নিকট গিয়ে নামাযের সংখ্যা কমানোর আবেদন জানান। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায (যাতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পাওয়া যাবে।) এর বিধান নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৮৮৭, ফাতহুলবারী ৭/২৫০,২৫৯, শরহে যুরকানী ৮/৪২, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১০, খাসায়েসুল কুবরা ১/১৫২)

রাসূলের ﷺ মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল, স্বপ্ন যোগে নয়

হুযুর ﷺ এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছিল। তবে এছাড়া অন্য সময় হুযুরের স্বাপ্নিক মি'রাজও হয়েছে। যার বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে। তথাপি কতিপয় লোক রাসূলের স্বশরীরের মি'রাজকে কিছু ভ্রান্ত যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যা আদৌ ঠিক নয়। মূলত প্রসিদ্ধ মি'রাজ স্বশরীরে হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীস সহ বিভিন্ন দলিল রয়েছে। তন্মধ্যে:

১. রূহানী মি'রাজ কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। বরং শারীরিক মি'রাজই আশ্চর্যের বিষয়। এ দিকে ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ঘটনার বর্ণনার শুরু করেছেন 'সুবহানা' শব্দ দিয়ে। তাছাড়া উক্ত আয়াতে 'বি আবদিহী' (অর্থাৎ, নিজের বান্দাকে) শব্দ রয়েছে। যা মি'রাজ স্বশরীরে হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২. মি'রাজ যদি স্বাপ্নিক হত তাহলে কেউ মুরতাদ হতো না। কারণ স্বপ্নের কোনো কিছুকে কেউ অস্বীকার করে না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. স্বশরীরে মি'রাজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। অতএব প্রসিদ্ধ মি'রাজকে রূহানী বা স্বাপ্নিক বলে ব্যক্ত করার কোন অবকাশ নেই। (শরহে যুরকানী ৮/১৩৮)

মি'রাজের শিক্ষা ও নসীহতঃ

মি'রাজের রাত্রে হুযুর ﷺ এবং তাঁর উম্মতকে তিনটি জিনিস হাদিয়া দেওয়া হয়।

১. এই উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরকাল আযাব দিবেন না। বরং তাকে একদিন অবশ্যই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং চিরকালের জন্য আরামে রাখবেন।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দিবেন এবং নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৩. সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ, যার মধ্যে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত মাগফিরাত দয়া ও অনুগ্রহ এবং কাফেরদের মুকাবেলায় সাহায্য ও সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাছাড়া এ আয়াতসমূহ রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে পড়লে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের সওয়াব সহ সমস্ত বিপদ আপদ থেকে সে ব্যক্তি হিফাযতে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী যে প্রাথমিক ভাবে এ তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সঠিক ও সুন্দরভাবে তা হাসিল করা। সাথে সাথে দীনের অন্যান্য বিষয় অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। বিশেষ করে দীনের যে পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জনকে ফরযে আইন ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই হাসিল করা। (সূরা বাকারাঃ ১৭৭, মুসলিম হাদীস নং ২৮৯)

শবে মি'রাজ সম্পর্কিত বর্জনীয় বিষয়সমূহঃ

মি'রাজের ঘটনা কোন্ বছর কোন্ মাসের কোন্ তারিখে এবং কোন্ রাতে হয়েছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে অনেক মতভেদ রয়েছে এবং এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে একবারই এসেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো মি'রাজ সংঘটিত হবে না। সুতরাং কোন একটা তারিখ চূড়ান্ত মনে করা ও অন্যান্যগুলিকে ভুল বলা যাবে না। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যায় না যে কোন তারিখের কোন্ রাতে মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল। শবে মি'রাজের ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে কোন ফযীলত কুরআন হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। সুতরাং সম্ভাব্য এই দিনে রোযা রাখা শবে কদরের মত এই রাতকে ফযীলতপূর্ণ মনে করা, রাতে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়া, দিনে রোযা রাখা, সরকারীভাবে শবে মি'রাজ পালনের উদ্যোগ নেওয়া, এই রাত্রকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে ভীড় জমানো, মসজিদে আলোকসজ্জা করা, রাত্র জাগরণ করা, বাড়ী বাড়ী মীলাদ পড়া, প্রচার মাধ্যমে এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা, পত্রপত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধন প্রকাশ করা, শবে মি'রাজ উপলক্ষে হালুয়া রুটির আয়োজন করা ইত্যাদি কোনটাই সহীহ নয়। শবে মি'রাজ যদি শবে বরাত বা শবে কদরের মত ফযীলতপূর্ণ কোন ইবাদতের রাত হত। তাহলে তার দিন তারিখ সংরক্ষিত থাকতো। রাসূল ﷺ থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হতো। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কোন না কোন আমল পাওয়া যেতো। অথচ এ বিষয়ে কুরআন হাদীসে কোন আমলের কথা বর্ণিত নেই। অতএব বৎসরের অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক ইবাদত বন্দেগী করাই আমাদের এ দিনের কর্তব্য। (সূরায়ে মায়েদা- আয়াত ৩, বুখারী-হাদীস ২৬৯৭, মুসলিম-হাদীস ৫৯৬)

রজব মাস শুরু হলেই প্রিয় নবী ﷺ এই দু'আ খুব বেশী করে পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ: "হে আল্লাহ পাক আপনি আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং রমযান শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে দেন।"

أخرجه الطبرانى فى الأوسط الحديث ৩৯৩৯

শা'বান মাসের করণীয় বর্জনীয়

শবে বারা'আতের কারনে শা'বানের মাসের গুরত্ব আমাদের নিকট অনেক বেশী। অনেকে এই ব্যাপারে একবারেই উদাসীন আর কিছু লোক এই আমলকে সামনে রেখে অনেক শরী'আত বিরোধী কাজ করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথার্থ বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

শরী'আতের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারা'আত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

লাইলাতুল বারা'আতের ফযীলত নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এ রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেশী বেশী ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে লাইলাতুল বারা'আতের ফযীলত ও করণীয় বিষয়ের কিছু হাদীস যথাযথ উদ্ধৃতি ও সনদের নির্ভরযোগ্যতা সহ উল্লেখ করা হলো।

প্রথম হাদীস

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন. নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা ১৫ই শা'বানের রাতে সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান-৫৬৬৫, সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ-৩/৩১৫)

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আ'লা ইবনুল হারেস থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাতে রাসূল ﷺ নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী নাড়া দিলাম, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন, তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা/হুমাইরা! তোমার কি এ আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না; ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা? নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন. তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল তখন ইরশাদ করলেন, এটা অর্ধ শা'বানের রাত। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করেন ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বেষপোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। (শু'আবুল ঈমান-হাদীস নং- ৩৬৩৫)

তৃতীয় হাদীস

একদা হযরত আয়েশা রাযি. হুযুর ﷺকে না পেয়ে খুঁজতে বের হলেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে পেলেন- তখন হুযুর ﷺ বললেন ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং 'বনূ কালব' গোত্রের পালিত ছাগল পালের শরীরের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী শরীফ-হাঃ নং ৭৩৯, ইবনে মাযাহ- হাঃ নং ১৩৮৫)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

চতুর্থ হাদীস

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন অর্ধ শা'বানের রাত যখন আসে তখন তোমরা এ রাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা এ রাতের সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দিব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাকে ডাকতে থাকেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ-১৩৮৪, শু'আবুল ঈমান-৩৮২৩-২২)

মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো। আরো বহু হাদীস কিতাবে বর্ণিত আছে।

উল্লেখিত হাদীস সমূহের সনদ বিষয়ক আলোচনাঃ

১ম হাদীসের সনদ সহীহ, এ জন্য ইমাম ইবনে হিব্বান একে কিতাবুস সহীহ-এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুনযিরী, ইবনে রজব, কাস্তাল্লানী, যুরকাবী, নুরুদ্দীন হাইসামী এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ এ হাদীসটিকে আমলযোগ্য সহীহ বলেছেন। (দেখুন! তারগীব তারহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯ লাত্বাইফুল মা'আরিফ ১৫১-৩, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫, শারহুল সাওয়াহিব-১০/৫৬১)

বর্তমানে আহলে হাদীস ভাইদের প্রসিদ্ধ শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রহ. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেন, 'এ সব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ প্রমাণিত হয়।' এরপর শাইখ আলবানী রহ. ঐ সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন, যারা কোনধরনের খোঁজ-খবর ছাড়াই বলে দেন যে লাইলাতুল বরা'আতের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। তদ্রূপ শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপূরী তুহফাতুল আহওয়াজী -২/৫৩-এ লাইলাতুল বারা'আতের হাদীসকে আমলযোগ্য প্রমাণিত করেন।

২য় হাদীসটি ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করার পর সনদের ব্যাপারে বলেছেন, 'মুরসালুন জায়্যিদুন' অর্থাৎ, আমলযোগ্য। ৩য় হাদীসটি আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সকল রাবী সিক্কাত, সনদের মধ্যে ইনক্বিতা থাকায় ইমাম বুখারী রহ. যয়ীফ বলেছেন। (দেখুন! সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ-৩/৩১৮)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪র্থ হাদীসটির সনদ যয়ীফ কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো- ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। দেখুন! (কিতাবুল আযকার-৭, ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৭, আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ-৫৭)

ফুক্বাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারা'আত

ফিক্বহে হানাফী

আল্লামা শামী, ইবনে নুজাইম, আল্লামা শরমবুলালী, শাইখ আব্দুল হক দেহলভী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী, মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে লাইলাতুল বারা'আতে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাগ্রত থেকে একাকীভাবে ইবাদত করা মুস্তাহাব, তবে জমায়েত হয়ে নয়। (আদ দুররুল মুখতার-২/২৪-২৫, আল বাহরুর রায়িক-২/৫২, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ-৩৬, মারাক্কিল ফালাহ-২১৯, জাওয়ালুস সিনাহ-১৭, লাইলাতুল বরা'আতের হাক্বীক্বত- শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী)

ফিক্বহে শাফেয়ী

ইমাম শাফী রহ.-এর মতেও শা'বানের ১৫তম রাতে অধিক অধিক দু'আ কবূল হয়ে থাকে। (কিতাবুল উম্ম-১/২৩১)

ফিক্বহে হাম্বলী

শাইখ ইবনে মুফলিহ হাম্বলী, আল্লামা মানসূর আল বাহুতী এবং ইবনে রজব হাম্বলী রহ. সহ প্রমূখ উলামায়ে কিরামের নিকট লাইলাতুল বারা'আতে ইবাদাত করা মুস্তাহাব। (দেখুন! আল মাবদা-২/২৭, কাশশাফুল কিনা-১/৪৪৫, লাত্বায়িফুল মা'আরিফ-১৫১-৬০)

ফিক্বহে মালিকী

ইবনুল হাজ্জ্ব মালিকী রহ. বলেন সলফে সালিহীন তথা পূর্বযুগের আউলিয়াগণ এ রাতকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এর জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। (আল মাদখাল-১/২৯২-৯৩)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সারকথাঃ সকল মাযহাবের উলামায়ে কিরামের মতে লাইলাতুল বারা'আতে ইবাদাত করা মুস্তাহাব।

আহলুল হাদীস ভাইদের প্রতি আবেদন

লাইলাতুল বারা'আত সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে আপনারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ইক্বতিযাউস সিরাতুল মুস্তাক্বীম-২/৬৩১-৬৪৩, আলবানী রহ. এর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম মুবারকপুরীর তুহফাতুল আহওয়াজী-২/৫৩ এবং ইবনে রজব হাম্বলীর লাত্বায়িফুল মা'আরিফ ১৫১-১৬০ ইত্যাদি প্রমুখ উলামাদের কিতাব দেখুন।

করণীয় ও বর্জনীয়

এ রাতে করণীয়ঃ বেশী বেশী নফল ইবাদত, যেমন- কুরআন তিলাওয়াত, যে কোন সূরা দিয়ে নফল নামায, যিকির আযকার, দু'আ ইস্তিগফার। উক্ত ইবাদাতসমূহ সমবেত ভাবে নয় বরং একাকী করতে হবে। উল্লেখ্য উক্ত রাতে কোন ধরা বান্ধা নিয়মে নফল নামায পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। উল্লেখ্য লাইলাতুল বারা'আতের পরদিন রোযা রাখা নফল ইবাদত, কেউ শা'বানের ১৩,১৪,১৫ তারিখে রোযা রাখতে পারলে উত্তম।

বর্জনীয়ঃ আতশবাজী, হালুয়া রুটি, শিরণী-তাবাররুক, মাইকে কুরআন তিলাওয়াত ও শবীনা, আলোকসজ্জা করা, মসজিদে বা বাড়ীতে জমায়েত হয়ে বড় আওয়াজে প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম করা, গোরস্থানে যাওয়া, মেলা বসানো, জামা'আতের সাথে সালাতুত তাসবীহ বা তাহাজ্জুদের নামায পড়া ইত্যাদি। (বিস্তারিত দেখুন!লাইলাতুল বরা'আতের হাক্বীক্বত মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী।)

রমযান মাসের করণীয় বর্জনীয়

হিজরী বছরের অত্যান্ত মূল্যবান মাস হলো এই রমযান মাস। এই মাসের প্রতিটি মূহুর্তকেই আমল দিয়ে সাজানো হয়েছে। যদিও আমরা গুটিকয়েক আমল দিয়ে এই মাস অতিবাহিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কেউ যদি আল্লাহর অলী হতে চায় তাহলে এটা একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স। এই মাসকে অলী হওয়ার সংক্ষিপ্ত কোর্স বলা হয়েছে। আরো একটি বিষয় হলো এই মাসকেই মানুষ যাকাত দেয়ার মাস মনে করে থাকে যদিও তা ঠিক না। তাই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই মাসের আমলের আলোচনাতে যাকাতের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই মাসের আলোচ্য বিষয়সমূহঃ

ক. রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

খ. তারাবীর নামায

গ. শবে ক্বদর

ঘ. যাকাত

ঙ. ঈদের চাঁদের শর'ঈ বিধান

ক. রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

১. রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: (তরজমা) হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করা হলো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৮৩)

হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় রমযান শরীফের রোযা রাখে, (অন্য বর্ণনায়) ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় তারাবীহের নামায পড়ে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারী শরীফ: হা: নং ১৯০১)

রোযার নিয়ত

রমযানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, 'আমি আজ রোযা রাখবো' অথবা দিনে আনুমানিক ১১টার পূর্বে মনে মনে এইরূপ নিয়ত করবে যে, আমি আজ রোযা রাখলাম। মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়, বরং মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

বি. দ্র. : আরবী ভালভাবে বলতে পারলে ও বুঝলে আরবীতেও নিয়ত করতে পারবে। অন্যথায় বাংলায় নিয়ত করা ভালো।

সাহরী ও ইফতার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রোযাদারের জন্য সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা সুন্নাত। বিশেষ কিছু না পেলে সামান্য খাদ্য বা কেবল পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। ইফতার খুরমা কিংবা খেজুর দ্বারা করা সুন্নাত। তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। ইফতারের কিছুক্ষণ পূর্বে এ দু'আটি বেশী বেশী পড়বে:

يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْلِيْ

অর্থঃ হে মহান ক্ষমা দানকারী! আমাকে ক্ষমা করুন। (শু'আবুল ঈমান: ৩/৪০৭)

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ। বলে ইফতার শুরু করবে এবং ইফতারের পর নিম্নের দুটি দু'আ পড়বে:

١. اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি, এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করলাম।) (আবূ দাউদ: ১/৩২২)

٢. ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

(অর্থঃ পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সতেজ হয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ রোযার সওয়াব নিশ্চিত হয়েছে।) (আবূ দাউদ: ১/৩২১)

৩. ইফতারীর দাওয়াত খেলে মেজবানের উদ্দেশ্যে এই দু'আ পড়বে:

اَفْطَرَ عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة

(অর্থঃ আল্লাহ করুন যেন রোযাদারগণ তোমাদের বাড়ীতে রোযার ইফতার করে এবং নেক লোকেরা যেন তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করে।) (আস্সুনানুল কুবরা, নাসাঈ ৬:৮১, ইবনুস সুন্নীঃ ৪৩৩)

রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

১. রমযানের প্রত্যেক দিনেই ঐ দিনের রোযার নিয়ত করা জরুরী। একদিনের নিয়ত পুরো মাসের রোযার জন্য যথেষ্ট নয়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

২. যদি কেউ রোযার নিয়ত ব্যতীত এমনিতেই সারা দিন না খেয়ে থাকে, তাহলে এটা রোযা বলে ধর্তব্য হবে না। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

৩. সুবহে সাদিকের পর খানা-পিনা জায়িয নেই। আযান হোক বা না হোক। লোক মুখে যে প্রচলিত রয়েছে যে, সুবহে সাদিকের পরেও আযান পর্যন্ত খাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ভুল। (রদ্দুল মুহতার:২/৪১৯)

৪. রোযা অবস্থায় গোসল করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তবে কুলী করার সময় গড়গড়া করবে না এবং নাকে পানি দেয়ার সময় নাকের মধ্যে জোরে পানি টানবে না। (দুররে মুখতার: ২/৪১৯)

৫. রোযা অবস্থায় কাউকে রক্ত দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। যদি রক্তদাতার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে।(রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৯)

৬. রমযান মাসের দিনে বা রাতে কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে যায় এবং তা যদি কয়েকদিন বা অবশিষ্ট পুরো মাস পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে প্রথম যে দিন বেহুঁশ হয়েছে ঐ দিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলির রোযার কাযা করতে হবে।(দুররে মুখতার: ২/৪৩২)

৭. রমযান মাসে কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার রোযা মাফ হয়ে যায়। তবে পুরো মাসের কোন অংশে সুস্থ হলে পূর্বের রোযাগুলোর কাযা করতে হবে।(আল বাহরুর রায়েক: ২/৫০৭)

৮. হস্তমৈথুন করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং তার কাযা আদায় করা জরুরী। এটা জঘন্য পাপকার্য। হাদীসে এইরূপ ব্যক্তির উপর লানত করা হয়েছে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৯)

৯. যদি রোযা অবস্থায় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায় এবং তা পরিমাণে কম হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। আর যদি রক্ত থুথুর সমান বা থুথু থেকে বেশী হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এবং তার কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৬)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১০. বাচ্চাকে দুধ পান করালে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নামায অবস্থায় দুধ পান করালে নামায ভেঙ্গে যায়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭১)

১১. সফরে যদি কষ্ট হয় তাহলে রোযা না রাখা জায়িয আছে বরং না রাখা উত্তম। আর সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই হল মুস্তাহাব। তবে রোযা রেখে ভাঙ্গা ঠিক নয়। কেউ যদি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাফফারা আসবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যদিও গ্রহণযোগ্য মত হল যে, এই সূরতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৪)

১২. কেউ রোযা রাখার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে গেলে অথবা পূর্বের রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে রোযা ভাঙ্গা জায়িয আছে। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। একান্ত কাযা করার শক্তি না পেলে উক্ত রোযার ফিদিয়া দিতে হবে অর্থাৎ, প্রত্যেক রোযার বদলে একজন গরীবকে দু'বেলা খাওয়াতে হবে বা পোনে দু'সের আটা কিংবা তার মূল্য গরীবকে দিতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৪২২)

১৩. নাবালেগ ছেলে-সন্তানদেরকে রোযা রাখার হুকুম করতে হবে, যদি তারা এর শক্তি রাখে এবং এর দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি না হয়। আর দশ বৎসর বয়সে রোযা রাখতে শুরু না করলে প্রয়োজনে প্রহার করা যাবে।(দুররে মুখতার: ২/৪০৯)

১৪. রমযানের দিনের বেলায় কোন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলে বা কোন কাফের মুসলমান হলে কিংবা মুসাফির সফর শেষ করলে বাকী দিন খানা-পিনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঋতুবতী মহিলার হুকুম

১. ঋতুবতী কোন মহিলার যদি দিনের বেলায় স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দিনের বাকী সময় খানাপিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। আর কোন মহিলার রোযা অবস্থায় ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে তার জন্য উপবাস থাকা জায়িয নেই। বরং সে চুপে চুপে খানা-পিনা করবে এবং পরবর্তীতে রোযাগুলির কাযা করবে। (দুররে মুখতার: ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

২. যদি কোন মহিলা ঔষধ সেবন করে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে তাহলে তাকে পুরো মাসই রোযা রাখতে হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করার দরুন কাজটি ঠিক হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া: ৬/৪০৪)

রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

১. রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া বা পান করা অথবা স্ত্রী-সহবাস করা। এতে কাযা ও কাফফারা (একাধারে দুই মাস রোযা রাখা) ওয়াজিব হয়। ২. নাকে বা কানে তৈল বা ঔষধ প্রবেশ করানো। ৩. নস্য বা হাপানী রোগীর জন্য ইনহেলার গ্রহণ করা। ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করা। ৫. বমি আসার পর তা গিলে ফেলা। ৬. কুলী করার সময় পানি গলার ভিতরে চলে যাওয়া। ৭. দাঁতে আটকে থাকা ছোলার সমান বা তার চেয়ে বড় ধরনের খাদ্যকণা গিলে ফেলা। ৮. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পরে জাগ্রত হওয়া। ৯. ধূমপান করা। ১০. ইচ্ছাকৃতভাবে আগরবাতি কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গলধকরণ করা বা নাকের ভিতরে টেনে নেওয়া। ১১. রাত্র মনে করে সুবহে সাদিকের পর সাহরী খাওয়া বা পান করা। ১২. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেবে ইফতার করা। এগুলোতে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার পর দিনের বাকী সময় রোযাদারের ন্যায় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৪০২)

রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ

১. মিথ্যা কথা বলা। ২. গীবত বা চোগলখোরী করা। ৩. গালাগালি বা ঝগড়া-ফাসাদ করা। ৪. সিনেমা দেখা বা অন্য কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া। ৫. সকাল বেলায় নাপাক অবস্থায় থাকা। ৬. রোযার কারণে অস্থিরতা বা কাতরতা প্রকাশ করা। ৭. কয়লা, মাজন, টুথ পাউডার, টুথপেষ্ট বা গুল দিয়ে দাঁত মাজা। ৮. অনর্থক কোন জিনিস মুখের ভিতরে দিয়ে রাখা। ৯. অহেতুক কোন জিনিষ চিবানো বা চেখে দেখা। ১০. কুলী করার সময় গড় গড়া করা। ১১. নাকের ভিতর পানি টেনে নেয়া। (কিন্তু উক্ত পানি গলায় পৌঁছলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।) ১২. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা। ১৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করা। (দুররে মুখতার: ২/৪১৬, বাদাইউস সানায়ে: ২/৬৩৫, কিতাবুল ফিকহ: ১/৯২৩)

যে সমস্ত কারণে রোযার ক্ষতি হয় না

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

১. ভুলক্রমে পানাহার করা। ২. আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা বা ফুল ইত্যাদির ঘ্রাণ নেওয়া। ৩. নিজ মুখের থুথু ও কফ জমা না করে গিলে ফেলা। ৪. শরীর বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা। ৫. ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা। ৬. ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়া। ৭. মিসওয়াক করা। ৮. অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া ৯. চোখে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করা। ১০ যে কোন ধরনের ইনজেকশন লওয়া। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৩৯৪)

রমযান মাসে ৪ টা কাজ বেশি বেশি করাঃ

(১) রোযা রেখে নিজেকে দেখা-শুনা করতে হবে, যাতে কোন প্রকার গুনাহ না হয়। গুনাহ ছাড়তে হবে।

(২) রমযান মাস কুরআন শরীফ নাযিলের মাস, তাই প্রতি দিন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের জন্য সময় রাখতে হবে। এটা রমযান মাসের হক।

(৩) কালিমায়ে তাইয়্যিবা বেশী করে পড়তে হবে।

(৪) রমযান মাসে এই দু'আ বেশি করে পড়তে হবে -

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

শবে ক্বদরের রাত্রিতে নিম্নের দু'আ বেশি বেশি পড়তে থাকা -

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

(আমালুল য়াউমি ওয়াললাইলাহ: হাদীস নং ৭৬৭ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৫০)

খ. তারাবীহ নামাযঃ

<u>তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আতঃ</u>

হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ .এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে শাইবা রহ .এর কিতাব আল মুসান্নাফ পৃঃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, এছাড়া হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব বাইহাকী পৃঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী পৃঃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি .থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের রাসূল ﷺ এর আমল দ্বারা ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায প্রমাণিত।" (আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ-১/৩৯০, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ-১/৪৯৪)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি .তার খেলাফত আমলে মসজিদে নববীর মধ্যে তারাবীহ নামাযের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা'আতকে একত্র করে হযরত উবাই বিন কাআব রাযি .এর ইমামতীতে ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামাযের হুকুম দিয়েছিলেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাঁর সমর্থন করেছিলেন। তারাবীহ নামায যদি নবী আলাইহিস সালাম থেকে ২০ রাকা'আত প্রমাণিত না হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি .অবশ্যই আপত্তি তুলতেন । (বাইহাকী পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক পৃঃ ৪/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩২, বুখারী পৃঃ ১/৪৭৪, হাদীস নং ২০১০, মাজামাউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া-২৩/১১২-১১৩ বাদায়েউস সানায়ে-১/৬৪৪)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাযি., চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. সহ সাহাবায়ে কিরামের রাযি. ঐক্যমতে, উম্মাতে মুসলিমার ১৪০০ শত বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক আমল তারাবীহ নামায বিশ রাকা'আত চলে আসছে। যা আজ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে চালু আছে। (বাইহাকী কুবরা পৃঃ ২/৪৯৬, হাদীস নং ৪৬১৭, পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল মুহাজ্জাব পৃঃ ৩/৩৬৩-৩৬৪)

ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ .যারা প্রত্যেকে স্বীয় যামানায় সব চেয়ে বড় কুরআন ও হাদীস বিশারদ ও ফকীহ ছিলেন তাদের সকলের মতে তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত, ৮ রাকা'আত নয়। (আলমাবসূত পৃঃ ২/১৯৬, ই'লাউস সুনান পৃঃ ৭/৬৯/৭১, আত্তামহীদ পৃঃ ৩/৫১৮, আলমুদাউওয়ানাতুল কুবরা পৃঃ ১/২৮৭, শরহুস্ সুন্নাহ পৃঃ ২/৫১১, মুগনী পৃঃ ২/৬০৪)

আট রাকা'আত তারাবীহ নামায পড়া রাসূলে আকরাম-ﷺ এর আমল ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.- এর ইজমা পরিপন্থী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিপরীত, অথচ নবী করীম ﷺ খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের জন্য তাকীদ করে গেছেন।(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, তিরমিযী হাদীস নং ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪২-৪৩)
আট রাকা'আত নামাযের হাদীসটি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দেসীনে কিরামের মতে একান্তভাবে তাহাজ্জুদের জন্য প্রযোজ্য। কোন অবস্থায় তা তারাবীহ নামাযের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ জন্য তাঁরা এ হাদীসটি তাদের কিতাবে তাহাজ্জুদের অধ্যায় এনেছেন, তারাবীহ অধ্যায়ে তারাবীহ নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা প্রমাণের জন্য আনেননি। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযি.কে বর্ণিত হাদীসটি এমন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর যার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ধারণা ছিল নবী ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে অন্য মাসের তুলনায় তাহাজ্জুদ নামায অনেক বেশি পড়তেন, তার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, “নবী করীম ﷺ রমযানে ও রমযানের বাইরে অন্যান্য মাসে আট রাকা‘আতের বেশী তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন না।”

এখানে তিনি এমন নামাযের কথা আলোচনা করেছেন যা রমযান শরীফে এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া যায়। আর তারাবীহ নামায রমযান ছাড়া অন্য মাসে পড়া যায় না। কাজেই এ হাদীস দ্বারা কস্মিনকালেও তিনি তারাবীহ নামায ৮ রাকা‘আত বুঝাননি। বরং তাহাজ্জুদের নামায ৮ রাকা‘আত বুঝিয়েছেন। যা রমযান ও রমযানের বাইরেও পড়া যায়।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কতক লোক যারা হাদীসের মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তারা এ হাদীসের দ্বারা তারাবীহ নামায ৮ রাকা‘আত প্রমাণ করে, যা নিতান্তই বোকামী।(বুখারী পৃঃ হাদীস নং ১১৪৭, বুখারী হাদীস নং ২০১৩)

তারাবীহ নামায মাত্র ৮ রাকা‘আত মনে করে পড়লে তা একাধারে নবী ﷺ এর আমল খুলাফায়ে রাশেদীন এর আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি .এর ইজমা বা ঐক্যমতের পরিপন্থী হওয়ায় জঘন্য বিদ‘আত এবং মনগড়া ইবাদত হবে। যা নবী করীম ﷺ -এর হাদীস অনুযায়ী গোমরাহী এবং জাহান্নামের আমল। এর থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। (বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭, মুসলিম হাদীস নং ১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪)

তারাবীহ নামাযে বিতর সহ ৪ রাকা‘আত পর পর ৫ টি বিরতি।(বাইহাকী হাদীস নং ৪৬২১, হিদায়া পৃঃ১/১৫০, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া পৃঃ ১/৬৫৪)

তারাবীহা অর্থ বিশ্রাম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শব্দটি বহু বচন হওয়াটা দলীল যে এ নামাযে দু’এর অধিক বিরতি বিশ্রাম হওয়া জরুরী। তারাবীহ ৮ রাকা‘আত হলে তা কখনো সম্ভব হবে না।

তারাবীহ সহ সকল প্রকার নামাযে তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করা জরুরী। তাজবীদ বিহীন অস্পষ্ট অতি দ্রুত তিলাওয়াত শরী‘আতে নিষেধ। (সূরায়ে মযযাম্মিল ৪ তাফসীরে মাজহারী পৃঃ৯/১০, তালীফাতে রশীদিয়া পৃঃ২৬৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

•খতমে তারাবীহ নামাযের পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টা নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী পৃঃ ৫/৫৬, ইমদাদুল মুফতীন পৃঃ ৩১৫, আহসানুল ফতওয়া ৩/৫১২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৭৩)

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে সুন্নাত তরীকায় তারাবীহ পড়ার জন্য হাফেয সাহেব নেয়ার শর্তাবলীঃ

১. হাফেয সাহেব ও তারাবীহ কর্তৃপক্ষ পরিস্কার ভাবে তারাবীহ নামাযের বিনিময় লেন-দেন না করার ব্যাপারে একমত হতে হবে।

২. তারাবীহতে খতমের সময় টাকা-পয়সা বা অন্য কোন প্রকার হাদিয়া, সম্মিলিত কালেকশনের কিংবা মসজিদ ফান্ডের টাকা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই হাফেয সাহেবকে দেয়া যাবে না, আর হাফেয সাহেবও নিবেন না। কেননা এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও গুনাহের কাজ।

৩. হাফেয সাহেবকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করা যাবে না, কেননা এভাবে কুরআন তিলাওয়াতে গুনাহ হয়। হাফেয সাহেব তারাবীহতে হদর অর্থাৎ, সহীহ শুদ্ধ করে মধ্যম গতিতে পড়বেন। তারাবীহতে লুকমা দেয়া হলে হাফেয সাহেব হা গ্রহণ করবেন, লুকমা গ্রহণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

৪. প্রতি চার রাকা'আতের শেষে 'সুবহানাল্লাহিল মুলকি' পড়া অথবা সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীসে প্রমাণিত নেই, এর জন্য হাফেয সাহেবকে হুকুম করা যাবে না। বরং সে সময় যে কোন দু'আ বা যিকির করা যেতে পারে। তেমনি ভাবে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাহ" তারাবীহ নামায শেষে গুরুত্ব সহকারে পড়া হয়, অথচ এভাবে পড়াও হাদীসে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এর জন্যও হাফেয সাহেবদেরকে হুকুম করা যাবে না।

৫. তারাবীহ নামাযের মাঝে হাফেয ইমাম বদল যে কোন চার রাকা'আতের পরে হওয়া উত্তম। দশ রাকা'আতের মাথায় না করা চাই।

৬. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের জামা'আত বা কিয়ামুল লাইল এর জামা'আত) তিন জনের বেশী মুসল্লী দ্বারা (চালু করা যাবে না। কারণ এটা না জায়িয ।

৭. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে প্রতিদিন স্বল্প সময়ের জন্য সুন্নাতের তালীম ও নামাযের আমলী মশক্বের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৮. হাফেয সাহেবদের রমযানের খানার ইন্তেযাম করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৯. প্রতিদিন যাতায়াত করলে তার খরচ এবং তারাবীহ খতম শেষে হাফেয সাহেব নিজ বাড়িতে পৌঁছার খরচ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

১০. খতমের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় কেউ যদি নিজ উদ্যোগে হাফেয সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগত ভাবে হাদিয়া পেশ করেন তাহলে শরিআতে তার অনুমতি আছে এবং এটা আলেম-উলামা ও তালেবে ইলমদের খেদমতের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারায় ২৭৩ নং আয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তবে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেউ করতে চাইলে করতে পারেন।

তারাবীহ এর বিনিময় গ্রহণের শরয়ী বিধান

তারাবীহ এর নামাযে ইমামতের বিনিময় আদান-প্রদান না-জায়িয হওয়া নির্ভরযোগ্য সকল ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত। অতীতের কোন ফক্বীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। এতদসত্বেও বর্তমানে কেউ কেউ নিজস্ব মতকে শরী'আতের মত ও ফিক্বাহবিদদের মত হিসাবে প্রচার করে তারাবীহ এর উজরতকে বৈধ বলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে সমকালীন বিশিষ্ট মুফতিয়ানে কিরামের ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ফাতাওয়া বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা।

ইবাদত বন্দেগী হিসাবে আমরা যা পালন করে থাকি, সাধারণত তা তিন প্রকারঃ

(ক) মাকাসিদ তথা খালেস ও মূল ইবাদাতঃ -যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দু'আ দুরূদ ইত্যাদি।

(খ) ওয়াসাইল তথা সহায়ক ইবাদাতঃ -যেমন ইমামত, ইকামত, দীনী শিক্ষাদান ও ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি।

(গ) রুক্বইয়াত তথা বালা মুসীবত থেকে পরিত্রাণ, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি এ জাতীয় দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্যে বৈধ দু'আ, খতম, ঝাড় ফুঁক, তাবীয-কবয ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার তথা মাকাসিদ জাতীয় ইবাদত করে বিনিময় নেয়া-দেয়া সম্পূর্ণ ও সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ ব্যাপারে কোন কালেও কোন মাযহাবের কোন নির্ভরযোগ্য আলেম ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। পক্ষান্তরে তৃতীয় প্রকার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমলের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। শুরু থেকে অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন মুজতাহিদ ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। (রদ্দুল মুহতার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫,৫৮ পৃষ্ঠা, আল মুদওয়ানাতুল কুবরা ৩য় খণ্ডঃ ৪৩১ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া রশীদিয়া-৪১৭পৃষ্ঠা।)

আর দ্বিতীয় প্রকার তথা আযান, ইমামত, কুরআন-হাদীস তথা দীনী তালীম এ জাতীয় পর্যায়ের ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদান অন্যান্য মাযহাবে জায়িয থাকলেও হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মতে নাজায়িয। কিন্তু উলামায়ে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) শরী'আতের বিশেষ উসূল তথা মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষ কতক ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদানকে বৈধ বলেছেন। সে উসূল হলো এ শ্রেণীর যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা দীনের স্থায়িত্ব তার উপর নির্ভরশীল বিধায় বিনিময়ের আদান-প্রদান বৈধ না হলে এ যুগে এসকল ইবাদত কায়েম রাখা সম্ভব হবে না, তাই দীনের স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই তা জায়িয। ফিক্বাহবিদগণ সে সকল ইবাদতকে চিহ্নিতও করেছেন আর তা হলোঃ ফরয ওয়াজিব নামাযের ইমামতি, আযান-ইকামত, দীনি শিক্ষাদান ইত্যাদি। (সূত্রঃ রদ্দুল মুহতার-৬ষ্ঠ খণ্ডঃ ৬৯০, ৬৯১ পৃষ্ঠা। ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা ইমাদদুল মুফতীন ৩১৩ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম-৩য় খণ্ড ৫২৭ পৃষ্ঠা)

পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকারের যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব নয় এবং শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, দীনের স্থায়িত্বও তার উপর নির্ভরশীল নয় যেমনঃ তারাবীহ এবং সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা। এ সকল ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানকে কোন আলেম জায়িয বলেননি বরং নির্ভরযোগ্য সকল ফিক্বাহবিদ লেনদেনকে হারাম বলেছেন। (ফাতওয়া রশীদিয়া ৩২৪পৃঃ, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম ৩য় খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা। আহসানুল ফাতওয়া ৩য় খণ্ড ৫১৪ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া দারুল উলুম ৪র্থ খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা।)

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের "ইসলামী জীবন পাতায়" একটি প্রশ্নের জবাবে দুজন আলেম তারাবীহের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একজন আলেম তার বর্ণনার এক পর্যায়ে লিখেছেন "যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ঐক্যবদ্ধভাবে রায় দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর হেফাজত তথা তালীমে ইলমে দীন, ওয়াজ নসীহত, আযান ইকামত এক কথায় যাবতীয়

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ধর্মীয় আমলগুলোর উপর হাদিয়া বা উজরত যে কোন নামে দেয়া নেয়ায় কোন দোষ নেই বরং উচিত।" এ উক্তির শেষ বাক্যে তিনি ইবাদাতের সব শ্রেণীকে একাকার করে ফেলেছেন। যার মর্ম দাঁড়ায় যে অন্যের জন্য নামায পড়ে, রোযা রেখে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে বলে যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ও আলেম ঐক্যবদ্ধ রায় দিয়েছেন। এমন কথা কোন মূর্খ বা দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট খেয়ানতকারী ছাড়া বলতে পারে না। তিনি প্রমাণ করতে গিয়ে যে সকল কিতাবের বরাত দিয়েছেন, সেগুলোতে এ জাতীয় ফতোয়ার কোন উল্লেখ নেই। আর তারাবীহের বিনিময় আদান-প্রদান বৈধতার কথা থাকার তো প্রশ্নই আসেনা। আর অপর আলেম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ইমামতের উপর কিয়াস করে তারাবীহের ইমামতকেও জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর বিনিময়কে জায়িয বলেছেন। অথচ তারাবীহের নামায একদিকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অপরদিকে জামা'আত সহকারে খতম তারাবীহের পরিবর্তে সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশও রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ডঃ ৪৫পৃঃ রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ)

পক্ষান্তরে পাঁচ ওয়াক্তের জামা'আত মুসাফির ও মাযূর লোক ছাড়া সকল সাবালক পুরুষের জন্য বিশেষ ওযর না থাকলে মসজিদে গিয়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাহলে উভয়টা এক রকম কি করে হলো? এ ছাড়া হাফেযগণ নিজ নিজ হিফয ঠিক রাখার তাগিদেই তারাবীহ পড়ানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায় বিনিময় না দিলে হাফেয পাওয়া যাবে না, বা খুব কম পাওয়া যাবে এ ধারনা তাঁর মধ্যে কি করে জন্ম হলো? তদুপুরি জনাব মুফতি সাহেব তারাবীর বিনিময় বৈধতায় নিজ মত উল্লেখ করার পর এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাআখখিরীনদের ফাতাওয়া নিম্নরূপ বলে যে বরাত দিয়েছেন তাতে সকলেই সর্বসম্মতভাবে এর বিনিময় লেন-দেনকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। তাঁরা পরিস্কার ভাবে বলেছেন তারাবীহের নামায সুন্নাত আর এর বিনিময় লেন-দেন হারাম। তাই সুন্নাত কায়েমের জন্য হারাম কাজের অনুমতি নেই। (ইমদাদুল ফাতওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা)
আর তৎপূর্ববর্তীগণ সম্ভবত তারাবীহ এর বিনিময় নেয়ার কল্পনা করেননি। যার কারণে তাদের কিতাবাদীতে এতদসংক্রান্ত কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া আলোচ্য মুফতী সাহেব তাঁর বর্ণনায় এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'তারাবীহের নামাযের ইমামতি অন্য নামাযের ইমামতি হতে পৃথক নহে।' (হেদায়া প্রথম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

এটা পত্রিকার ছাপার ভুল না হয়ে থাকলে ইলমী বিষয়ে চরম খেয়ানত বিবেচিত হবে। কেননা হেদায়া গ্রন্থের কোথাও তারাবীহের জামা'আতের ইমামতীকে অন্য

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

নামাযের ইমামতীর ন্যায় বলা হয়নি, এটা নিছক মুফতী সাহেবের নিজস্ব উক্তি, যার রেফারেন্স কোন ফাতাওয়ার কিতাবে নেই।

সারকথা, ঢালাওভাবে সকল ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদান-প্রদানের কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান-ইমামত যেমন জরুরত, তারাবীহের ইমামত ঠিক সে রকম জরুরত সে কথাও কোথাও নেই। বরং আকাবির সাহাবাগণ তো তারাবীহ নামায নিজ নিজ বাড়িতে পড়তেন। এ কারণে বর্তমান ও নিকট অতীতের সকল নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া অনুযায়ী তারাবীহ-এর ইমামতী করে বিনিময় দেয়া ও নেয়া বৈধ নয়। আর হাদিয়ার সাথে তারাবীহ এর ইমামতের কোন সম্পৃক্ততা নেই। কাজেই হাদিয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। খতমের সময় ব্যতীত অন্য সময় যদি হাফেজ সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ হাদিয়া পেশ করেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ এবং তা শরী'আতেও অনুমোদিত। (ফাতাওয়া রশীদিয়া ৩২৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৪ পৃষ্ঠা, ফাইজুল বারী ৩য় খণ্ডঃ ১৮১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হাফেজদের নিজেদের হারাম রিযিক থেকে পরহেজ করা ফরয এবং মুসল্লীদেরও উচিত ক্বারী, হাফেজ আলেমদেরকে সহীহ পন্থায় হাদিয়া পেশ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

গ. শরী'আতের দৃষ্টিতে শবে ক্বদর

শবে ক্বদর এমন একটি মহা পূণ্যময় রজনী যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রদান করেছেন। অন্য কোন উম্মত উক্ত পবিত্র রজনী পায়নি।

শবে ক্বদরের ফযীলত

১.উক্ত রজনীর অধিক গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফযীলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে কারীমে স্বতন্ত্র একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যার নাম সূরাতুল ক্বদর।

২.শবে ক্বদরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীম লাউহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশ অবতীর্ণ করেন।(সূরাতুল ক্বদর: ১)

৩.শবে ক্বদরের এক রাত্রির ইবাদাত তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম। (সূরাতুল ক্বদর:৩)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৪.হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নবীয়ে পাক ﷺ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদর ইবাদতের মাধ্যমে কাটাবে আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ কবে দিবেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৭৫)

৫.এই রাত্রে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের একটি জামা'আত নিয়ে পৃথিবীতে শুভাগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতগুযার বান্দাদেরকে সালাম ও রহমতের দু'আ করতে থাকেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর:৮/৪১৪)

ক্বদরের রাত কোনটি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, আমি কুরআনে কারীমকে ক্বদরের রাত্রে অবতীর্ণ করেছি। (সূরাতুল ক্বদর: ১)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ রমযান মাসে কুরআনে কারীমকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (বাকারা:১৮৫)

উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে ক্বদর রমযান মাসেই সংঘটিত হয়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর। (বুখারী শরীফ: হাঃ নং ২০১৭, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ১১৬৯)

যির ইবনে হুবাইশ রহ. বর্ণনা করেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. কে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলে থাকেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর জাগ্রত থাকবে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবেই। উত্তরে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. বলেনঃ আল্লাহ তার উপর রহম করুণ তিনি ইচ্ছা করেছেন লোকেরা যেন এক রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। নিশ্চয় তিনি জানেন তা রমাযানে এবং তাও জানেন যে তা রমযানের শেষ দশকে এবং ২৭ তারিখে। অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. শপথ করে বললেনঃ অবশ্যই তা ২৭ তারিখের রজনীতেই হয়ে থাকে। যির ইবনে হুবাইশ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবুল মুনযির! (উবাই ইবনে কা'আব এর উপ নাম) এটা কিসের ভিত্তিতে বলছেন? তদুত্তরে তিনি বললেনঃ আলামত বা নিদর্শনের ভিত্তিতে যা রাসূল ﷺ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমাদেরকে বলে দিয়েছেন; সে দিন সূর্যের কিরণ থাকে না। (মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৭৬২)

শবে ক্বদর হাসিল করার উপায়

ক. রমযানের শেষের দশকে ই'তিকাফ করা অর্থাৎ, ২০শে রমযান সূর্য ডোবার পূর্ব হতে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। পেশাব পায়খানা বা ফরয গোসলের প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

খ.এটা সম্ভব না হলে অন্তত শেষ দশকের শুধু রাত গুলোতে মসজিদে নফল ই'তিকাফ করা। দিনে দুনিয়াবী জরুরত পূর্ণ করা।

গ.এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শেষ দশকের ইশা ও ফজরের নামায গুরুত্ব সহকারে জামা'আতের সাথে আদায় করা। এবং বেজোড় রাতগুলোতে নফল নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে বেশী করা।

শবে ক্বদরে করণীয় কাজসমূহ

১.এ পূণ্যময় রজনীতে অবহেলা না করে গুরুত্ব ও ইখলাসের সাথে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকা চাই। চাই নফল নামায বা তিলাওয়াত যিকির আযকারে হোক কিংবা দু'আয় মশগুল থাকার মাধ্যমে হোক।
২.নিজের জীবনের পাপরাশির কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি মিনতি ও রোনাজারীর সাথে তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া। (সূরা নূহ: ১০)

৩.ইখলাসের সাথে সাওয়াবের আশায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নেক আমলে লিপ্ত থাকা। (বুখারী: হাঃ নং ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৫)

৪.এ রাত্রিতে বেশী বেশী নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে থাকা-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

(আমালুল য়াউমি ওয়াললাইলাহ: হাঃ নং ৭৬৭ ইবনে মাজাহ: নং ৩৮৫০)

৫. উক্ত রাত্রির কিছু অংশ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকা। কিছু অংশে নফল নামায বিশেষ করে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা। আর কিছু অংশে যিকির আযকার দু'আ মুনাজাত করা। (সূরা আনকাবূত:৪৫)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শবে ক্বদরে বর্জনীয় কাজসমূহ

১.মসজিদে নিঃপ্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোক-সজ্জা করা। কারণ এটা অপব্যয়। আর অপব্যয় করা নাজায়িয। (সূরায়ে আ'রাফ: ৩১, বনী ইসরাঈল:২৭)

২.জামা'আতের সাথে সালাতুল তাসবীহ, তাহাজ্জুদ কিংবা অন্য কোন নফল নামায পড়া। কারণ নফল নামায জামা'আতের সাথে নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার: ১/৫৫২)

৩.ঘোষণা করে মসজিদে সম্মিলিত দু'আর আয়োজন করা। হ্যাঁ ! ঘোষণা বা ডাকাডাকি ছাড়া এমনিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা দু'আ করে নিলে তা জায়িয।

৪.এই রাতে মসজিদে প্রচলিত মীলাদ-ক্বিয়াম করা। কারণ ইহা সুস্পষ্ট বিদ'আত। (মুসনাদে আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৯)

৫. এত অধিক রাত্র পর্যন্ত জাগ্রত থাকা, যাতে ঘুমের তাড়নায় ফজরের জামা'আত ছুটে যায় কিংবা কাযা-ই হয়ে যায় বা এমন হয়ে যায় যে নামাযে কি সূরা কালাম পড়ছে তা নিজেরও খবর নেই। (মুআত্তা ইমাম মালেক: হাঃ নং ১৫৫, আল ইসাবা: ৩/২০০)

বি:দ্র: মসজিদে ইমাম ও খতীবগণের কর্তব্য ঐদিন লম্বা সময় ওয়াজ ও বয়ানে না কাটানো। বরং তার আগে জুমু'আয় বা কোন একদিন শবে ক্বদরের আহকাম বলে দেয়া। একান্ত ঐ দিনই কথা বলার প্রয়োজন হলে সংক্ষেপে এই রাত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কিছু কথা বলে মুসল্লীদেরকে উৎসাহ দিয়ে ইবাদতের প্রতি নিবিষ্ট করার চেষ্টা করবে। তবে সর্বাবস্থায় জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন ঘটনাবলী বর্ণনা থেকে বিরত থাকা চাই। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: হাঃ নং ৭)

পটকাবাজী, আতশবাজী ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা। বিশেষ করে অভিভাবকদের কর্তব্য হলো ছোটদেরকে উক্ত ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া এবং তাদের হাতে টাকা পয়সা না দেয়া। কারণ এই অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে নিজেকে যেমন উক্ত রাতে অনেক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, ঠিক তেমনই উক্ত জিনিসগুলোর বিকট ও ভয়ংকর শব্দের দরুন আল্লাহর বান্দাদেরকে আতংকের মধ্যে ফেলে কষ্ট দেয়া হয়। তাই উক্ত শরী'আত পরিপন্থী জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহ ও হারাম।(সূরা বাকারা: ১১৪, বনী ইসরাঈল: ২৭)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এই রাত্রকে উপলক্ষ করে অধিক ও উত্তম খানা ও তাবারকের আয়োজন থেকে বিরত থাকা। মসজিদে শিরনী, মিষ্টি ইত্যাদির আয়োজন থেকে বেঁচে থাকা।

ঘ.যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

যাকাতের আভিধানিক অর্থ

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া (বস্তুত যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়।)

পারিভাষিক অর্থ

কোন অসচ্ছল গরীব মুসলমানকে বা মুসলমানদেরকে কোন প্রকার বিনিময় ও শর্ত ছাড়া যে সকল মালের উপর যাকাত প্রযোজ্য ঐ মালের (বর্তমান বাজারের বিক্রয় মূল্যের) চল্লিশ ভাগের এক অংশের মালিক বানানো। (আদ্দুরুল মুখতার ২:২৫৬)

যাকাত আদায়ের হুকুম ও তরককারীর পরিণতি

যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম রুকন, নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সম্পদের মালিকের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়। যাকাতের ফরযিয়্যাত স্বীকার করে আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।
যারা যাকাত আদায় করবে না তাদের সম্পর্কে কুরআন হাদীসে অনেক কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন (তরজমা) "যারা স্বর্ণ রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না (অর্থাৎ, যাকাত দেয় না) তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদ উত্তপ্ত করা হবে এবং সে গুলোর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে।"

সেদিন বলা হবে এগুলো সেই সম্পদ যার যাকাত না দিয়ে তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা-৩৪/৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার গলায় সেই মালকে সাপ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিবেন। অন্য এক

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হাদীসে আছে যে, সাপ তার দুই চোয়ালে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চয়। (তিরমিযী হাঃ নং ২৪৪১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৮৪)

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আরো অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

যাকাত যোগ্য সম্পদ ও যাকাতের নিসাব

ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য, অথবা ৫২.৫ তোলার রূপার মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের মালের মালিক হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়। (আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

উল্লেখ্য যে, কোন প্রকার সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ না হয়ে একাধিক প্রকারের অল্প অল্প হয়ে সমষ্টিগতভাবে মূল্য হিসাবে ৫২.৫ তোলার মূল্য সমপরিমাণ হলেও যাকাত প্রযোজ্য হবে। (আল বাহরুল রায়েক ২:৪০০,৪০১)

যাকাত যার উপর ফরয হয়

সাবালক সজ্ঞান মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়।

একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি (যেমন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে) নেসাবের মালিক হলে প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। নেসাবের মালিক প্রত্যেকের উপরই যাকাত আদায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত স্বামীর উপর বর্তায় না, তেমনিভাবে সন্তানদের যাকাত পিতার উপর বর্তায় না। তবে কেউ যদি অন্যের অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত কাকে দিবেন?

যাদের সাথে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার পিতা মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, প্রমুখ এবং দাতার সাথে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত ফিতরা দেওয়া যায় না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অনুরূপ ভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তি (নেসাব পরিমাণ মালের মালিক) কিংবা ধনীর নাবালেগ সন্তানকে দান করলেও যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। বরং যাকাত ফিতরা দিতে হবে এমন গরীব ও ফকীর মিসকীনকে যাদের নিকট নিসাব পরিমাণ মাল নেই।

ধর্মীয় খিদমতে রত নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে যাকাত ফিতরা দান করলে ধর্মীয় খিদমতের সহযোগিতা হিসেবে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। (সূরা বাকারাঃ ২৭৩)

যাকাত কখন আদায় করতে হয়?

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় যদি রমযান মাস না হয়ে অন্য কোন মাস হয় তাহলে সে মাসেই যথা তারিখে সমুদয় মালের হিসাব নিকাশ করে যাকাতের পরিমাণ বের করা জরুরী। আদায়ের ক্ষেত্রেও রমযানের অপেক্ষা না করে সাথে সাথে আদায় করে দেওয়া জরুরী। যাতে রমযানের পূর্বে ইন্তেকাল হয়ে গেলে ফরয জিম্মায় বাকী না থেকে যায়। দেরি করে আদায় করলে যদিও যাকাত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াজিব তরক করার দরুন গুনাহগার হতে হয়। তবে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

যাকাত সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল

১। শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে তার যাকাত আদয়ের পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হয় চাই তা ব্যবহার করুক বা নাই করুক ঋণ মুক্ত অবস্থায় তার নিকট এক বৎসর কাল থাকলে তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যদি তার নিকট অন্য কোন মাল না থাকে তাহলে উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত স্বর্ণ বা রূপা থেকে কিছু

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার ২:২৯৫)

২। যদি ব্যাংকে বা অন্য কোন তহবিলে কারো টাকা জমা থাকে আর ঐ টাকাগুলো ঋণমুক্ত অবস্থায় নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত দিতে হবে। (আলমগীরী ১:৭২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩:৫৭)

৩। দোকান/বাড়ী ভাড়ার জন্য প্রদত্ত এডভান্স টাকায় যাকাত

যদি কোন সাহিবে নিসাব ব্যক্তি দোকান কিংবা বাড়ী ভাড়া নেয় আর মালিকের নিকট সিকিউরিটি হিসাবে জমা রাখে যা পরবর্তীতে ফেরতযোগ্য তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দেয়া ফরয। কারণ, উক্ত টাকা তার মালিকানায়ই রয়েছে । জমা রাখার দরুন তার মালিকানা শেষ হয়নি, সুতরাং অন্যান্য মালের সাথে হিসাব করে তার এ টাকার যাকাতও আদায় করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ২:৩০৫, দারুল উলূম ৬:৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫১)

তবে উক্ত টাকা যদি এডভান্স ভাড়া হয় যা থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু কাটা যায় তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না।

৪। টাকা ও স্বর্ণ রূপা মিলে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাতের হুকুম

স্বর্ণ বা রূপার মধ্যে যে কোন একটির গহনা আছে, কিন্তু নিসাব পরিমাণ নয়, কিন্তু তাহার সাথে নগদ টাকা (চাই পাঁচ/দশ টাকাই হোক না কেন) সারা বৎসর হাতে আছে। যদি উক্ত স্বর্ণ বা রূপার সাথে টাকা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। (রদ্দুল মুহতার ২:২৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৫০)

৫। করয দেয়া টাকার উপর যাকাত

করয দেয়া টাকা উসূল হওয়ার পর উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছর সমূহে উক্ত টাকার যাকাত না দিয়ে থাকলে সেই বকেয়া যাকাতও দিতে হবে। তবে কেউ যদি করযের টাকা উসূল হওয়ার পূর্বে প্রতি বছর উক্ত টাকার যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২:২৬৬, দারুল উলূম ৬:৪৫,৭৭)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যে করযের টাকা পাওয়ার কোন আশা নেই সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কখনো উসূল হয় তাহলে সে বছর থেকে যাকাত দিবে। অতীতের যাকাত দিতে হবে না। (কিতাবুল ফিকহ ১:৫৪৮, দূররে মুখতার ও রদ্দুলমুহতার খণ্ড-২ পৃ-২৬৬)

৬। যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দেওয়া

যাকাতের নিয়্যতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীক তথা অন্যকে খালেছ ভাবে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। আর যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দিলে গরীবকে যাকাতের টাকার মালিক বানানো হচ্ছে না । তাই এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে না।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের সঠিক পন্থা হলো, ঋণ দাতা প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে গরীব ঋণ গ্রহীতাকে নিঃশর্তভাবে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিবে। তারপর তার থেকে পাওনা ঋণের টাকা উসূল কবে নিবে, এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও উসূল হয়ে যাবে। (আদদুররুল মুখতার ২:২৭০, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৭১, রহীমিয়া ২:১২)

৭। রাজনৈতিক দলকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যদি কোন রাজনৈতিক দল যাকাতের টাকা কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা সেবার নামে সংগ্রহ করে আর সেগুলোকে ইলেকশনে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ব্যয় করে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ভাতা হিসেবে প্রদান করে তাহলে তাদেরকে এ জাতীয় সদকা (অর্থাৎ, সদকায়ে ওয়াজিবাহ) প্রদান করা জায়িয নয়। এবং এতে যাকাত দাতার যাকাত আদায় হবে না। (খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৭)

৮। মসজিদ মাদরাসার কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাতের প্রকৃত হকদারকে বিনিময়হীন ভাবে উক্ত মালের মালিক বানিয়ে দেয়া। নির্মাণ কাজে ব্যয় করলে যেহেতু কোন হকদার ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না তাই এ সুরতে যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং এসব নির্মাণ কাজে কেউ যাকাত দিয়ে থাকলে ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দ্বিতীয়বার আদায়

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করতে হবে। উল্লেখিত কারণেই যাকাতের মাল জনকল্যাণমূলক কাজে যেমন, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা না জায়িয। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে টিভি চ্যানেল বা পত্র-পত্রিকার কাজে যাকাত দিলে সে যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরী ১:১৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৮২)

৯। হিসাব করে যাকাত দেয়া জরুরী

বহু লোক যাকাত-ই দেয় না। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা যাকাত দেয় ঠিক কিন্তু যাকাত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে না।

শরী'আতে যখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে বলা হয়েছে তখন উহার দাবী হলো যাকাতযোগ্য সমস্ত সম্পদ হতে হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ বের করে যাকাত দেয়া। যদি কেউ হিসাব না করে যাকাত আদায় করে আর এই টাকাও নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে কম আদায় করে তাহলে তার জন্যও আখিরাতে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। (সূরা তাওবা ৩৪/৩৫)

হিসাব করার সময় যাকাতযোগ্য মালের বর্তমান বাজার দর হিসেবে হিসেব বের করবে। যে দামে খরিদ করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে যে দামে বেচা যাবে তা ধর্তব্য নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২:২৮৬)

উল্লেখ্য যে, গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও যাকাতের মাল দেয়া যায় বরং তাদেরকেই আগে দেওয়া উচিত। অবশ্য তাদেরকে হাদিয়া বলে দেয়া ভালো যাতে তারা মনে কষ্ট না পায়। তবে মেহমানে রাসূল তালিবে ইলমের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাদেরকে যাকাতের বড় অংশ দেয়া উচিৎ তাতে যাকাত তো আদায় হবেই সেই সাথে কুরআনী তা'লীমের সহযোগিতা করার দরুন ছদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবও হাসিল হবে। (সূরায়ে বাকারা ২৭৩)

ঙ. ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার শর'ই নীতিমালা

শরী'আতের বিধান মতে চাঁদের উদয়স্থল মেঘলা থাকলে রমযানের এবং অন্যান্য মাসের জন্য মাত্র ১ জন আর ঈদুল ফিতরের জন্য মাত্র ২ জন বালেগ মুসলমানের স্বচক্ষে চাঁদ দেখার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর চাঁদের উদয়স্থল সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকলে সব মাসে জম্মেগাফীর তথা এমন সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দাতা আশ্বস্ত হতে পারেন যে, এতগুলো লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না। এদের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মত অনুযায়ী নির্দিষ্ট নয় এ পরিমাণ হতে হবে যে, সিদ্ধান্ত দাতা সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন।

সংশয় নিরসন

ক. কেউ কেউ মনে করেন, চাঁদের ফয়সালা দিতে হলে কাজী হওয়া জরুরী। বর্তমান সরকারী হেলাল কমিটি হল কাজীর হুকুমে। কাজেই অন্য কেউ এ ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন না। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে শর'ই ফতওয়া হল, ইসলামী হুকুমতের অবর্তমানে ঈদ জুম'আ এজাতীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রে দেশের প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম উলামাদের পঞ্চায়েতই কাজীর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হবেন। সুতরাং তারা শর'ই নীতিমালার ভিত্তিতে রমযান ও ঈদের ফয়সালা দিতে পারবেন, যা ঐ দেশের সকলের জন্য (যদি তাদের নিকট সে সংবাদ পৌঁছে যায়) মান্য করা জরুরী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৪৫৬পৃষ্ঠা, রুইয়াদে হেলাল পৃ. ৬০/৬১, ইসলাম আওর জাদীদ দাওর কে মাসাইল ১২৬/১২৭ পৃষ্ঠা)

খ. আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, সরকারী চাঁদ দেখা কমিটিতেও তো আলেম আছেন। অপর দিকে বেসরকারী উলামা মাশাইখগণ তার বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন-এখন আমরা কোন আলেমদের সিদ্ধান্তের উপর আমল করব। এর উত্তর হলো- যারা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিবেন তাদেরটা মান্য করা জরুরী, আর যারা বলবে আমাদের নিকট কোন প্রমাণ আসেনি, বা পাইনি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। (বুখারী শরীফ ১: ৩৬০, বাবু ইযা শাহিদা শাহিদুন, কাওয়ায়ে ফী উলুমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ২৯০)

যেমন মক্কা বিজয়ের সময় হযরত মহানবী ﷺ কাবা শরীফের মধ্যে নামায পড়ে ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সাহাবাদের রাযি. থেকে দু ধরনের বর্ণনা আছে। পড়ার এবং না পড়ার। কিন্তু রাসূলের ﷺ নামায পড়ার পক্ষে যারা প্রমাণ দিয়েছেন সমস্ত উলামাগণ তাদের কথা গ্রহণ করেছেন।আর যারা নামায পড়েননি বলেছেন তাদের কথা কেউ গ্রহণ করেননি। বরং তাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তাঁরা যেহেতু ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না এবং তাঁরা নামায পড়তে দেখেননি, তাই তারা নিজের ইলম অনুযায়ী বলেছেন, যা দলীল প্রমাণের বিপরীত হওয়ায় গ্রহণ যোগ্য নয়।(ফাতহুলবারী,৫৯৭-৮ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৬০১, উমদাতুলকারী,৩৭০ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৭)

(গ) অনেকে প্রশ্ন করেন জাম্মেগাফীর হতে হলে ৫০ জন লোক হতে হবে এবং তাদের সকলের একই এলাকা হতে হবে। এর উত্তর হলো যে নির্ভরযোগ্য মত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অনুযায়ী কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং এক এলাকা থেকে হতে হবে এরও কোন দলীল নেই বরং জাম্মেগাফীর এর মূল কথা হল যে, বিভিন্ন এলাকা হতে এ পরিমাণ লোক বর্ণনা দিতে হবে যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা পুরাপুরি আশ্বস্ত হয়ে যায়। (মুফতি শফী রহ. সংকলিত রুইয়াতে হেলাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)

মজার ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, বর্তমান যমানায় জাম্মেগাফীর থেকে দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দেয়া বেশী যুক্তিযুক্ত এবং এর দ্বারাও উদয়স্থল পরিস্কার থাকার ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদ প্রমাণিত হবে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, চাঁদ তালাশ করার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চরম অনীহা রয়েছে। অপর দিকে কেউ চাঁদ দেখার খবর দিলে তার উপর নানা রকম হয়রানী ও অত্যাচার করা হয়। যে কারণে যারা চাঁদ দেখে তারাও বলতে সাহস করে না। এমতাবস্থায় জাম্মেগাফীর তথা অনেক লোকের দেখার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে, অনেক লোক জোগাড় করতে করতে রোযা বা ঈদ দু তিন দিন পরে করতে হবে, যা শরী'আতে কোন অবস্থায় কাম্য নয়। (দেখুন ফাতাওয়া শামী, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

চাঁদ দেখা কমিটি কেমন হওয়া উচিত

(ক) বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদ দেখা কমিটিতে কিছু আলেম থাকলেও কোন বিজ্ঞ মুফতী (যিনি কোন নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া বিভাগ পরিচালনা করেন) আছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর দু'একজন যারা আছেন, তাদের কথাও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং এ ধরণের হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। সরকারের যদি জটিলতা এড়ানোর সদিচ্ছা থাকে তাহলে এক বা একাধিক এ ধরনের মুফতীকে চাঁদ দেখা কমিটির শুধু সদস্যই নয় বরং তাকেই আমীরে ফয়সালা নিযুক্ত করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৮, খণ্ড ১৭)

(খ) শুধু ডিসিদের উপর ভিত্তি না রেখে প্রত্যেক জেলার বড় মাদরাসার দায়িত্বশীলকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার খবর দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিতে হবে।

(গ) চাঁদ দেখা কমিটি বর্তমানে যেভাবে চাঁদ দেখার প্রচার করেন তা শরী'আত সম্মত হয় না এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে তা মান্য করাও দেশবাসীর জন্য জরুরী হয় না। সুতরাং কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কে কে চাঁদ দেখেছেন কোন

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে রোযা বা ঈদের ফয়সালা করেছেন তা উল্লেখ করে চাঁদ দেখার ঘোষণা দিতে হবে।

(ঘ) সর্বোপরি চাঁদ দেখা না গেলে সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত দেয়া বন্ধ করতে হবে। বলতে হবে এখনো শরী'আত সম্মতভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আপনারা অপেক্ষা করুন । কারণ সারা দেশ থেকে এত অল্প সময়ে শরী'আত সম্মত ভাবে খবর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

(ঙ) যারা চাঁদ দেখার সংবাদ দেয় তাদের খবর গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে। বিবেচনা করতে হবে।

শাউয়াল মাসের করণীয় বর্জনীয়

আরবী বছর বা হিজরী বছর অনুযায়ী রমযান মাসের পরের মাস হলো শাউয়াল মাস। এই মাসকে "শাউয়ালুল মুকাররম" বলা হয়। এই মাসে আমলের সাথে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

প্রথম আমলঃ ঈদ পালন করা

ঈদের রাত্রের ফযীলত

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে তার অন্তর সেই দিনও মৃত্যু বরণ করবে না যে দিন সকলের অন্তর মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২)
ঈদের আমলের বিস্তারিত বিবরণ যিলহাজ্জ মাসের করণীয় বর্জনীয়তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই ঈদ-যাপন নিয়ে আমাদের মাঝে একটি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তা নিরশনে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলোঃ

সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা ও ঈদ

শরী'আত কী বলে?

সম্প্রতি কিছু লোক সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ উদযাপন নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করছে। আমাদের দেশের কিছু এলাকায় সৌদিআরবকে মডেল বানিয়ে সৌদিআরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

পালনও শুরু করেছে। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো, ‘হানাফী মাযহাবেই সারা বিশ্বে এই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে বলা হয়েছে’। অথচ কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও হানাফী মাযহাবের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, সারা বিশ্বে একদিনে রোযা ও ঈদ শুরু করা শরীয়াতের চাহিদা নয় । বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকার লোকজন নিজের এলাকার চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ শুরু করাই শরীয়াতের হুকুম। নিম্নে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ফিকহে হানাফীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো যাতে বিভ্রান্তির নিরসন হয় এবং সত্য প্রেমিরা পথ খুঁজে পায়।

এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

‘সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই রমযান মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।’ (সূরা বাকারা: ১৮৫)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে অঞ্চলের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তারা রোযা শুরু করবে। এখানে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করতে বলা হয়নি।

সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: يسئلونك عن الاهلة ‘লোকেরা আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে...’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদের রহস্য কী? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা রোযা শুরু করা ও রোযা খতম করার সময় নির্ধারণী হিসেবে নতুন চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৪৮৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আয়াতে চাঁদ বুঝানোর জন্য هلال শব্দের বহুবচন الاهلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ নতুন চাঁদসমূহ। এখানে বহুবচন ব্যবহার করাই হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, মাতলা বা উদয়স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে রোযা ফরয হওয়ার বিধান জারী হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হেলাল তথা নতুন চাঁদের ভিত্তিতে ভিন্নভিন্ন উদয়স্থলের লোকদের উপর রোযা ফরয হবে। আর কুরআনের যেখানে শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে তা শানে নুযূল তথা অবতীর্ণের উৎস মূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। (বিস্তারিত জানতে দেখুন মাবাহেস ফী উলূমিল কুরআন পৃ.৭৮ শায়েখ মান্না কাত্তা)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ ব্যাপারে সুন্নাহর ভাষ্য:

১. হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর, আবার চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদুল ফিতর) করো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করো।’ (সহীহ বুখারী হা.নং১০৯০, মুসলিম হা.নং ২৫৬৭)

এই হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝে আসে যে, চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে, আবার চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। কাছের এলাকা বা শহর থেকে যদি চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তা গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে এই হাদীসে কোনো নির্দেশনা নেই। কিন্তু অপর এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি নিকটবর্তী কোনো এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তাহলে নিজেরা চাঁদ না দেখলেও তা গ্রহণ করা হবে।

যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, গ্রামে বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি নবীজী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি গত রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্যপ্রদান কর যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি উত্তর দিল হ্যাঁ। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলাল রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও তারা যেন আগামী দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করে। (আবূ দাউদ হা.নং ৬৯১, নাসায়ী হা.নং২১১২)

বর্ণিত হাদীসে আগত ব্যক্তি শহরের বাহির থেকে এসে চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণও করেছেন। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, নিজেরা চাঁদ না দেখলেও কাছের এলাকার বা শহরের কারো দ্বারা চাঁদ দেখা প্রামাণিত হলেও রোযা রাখা ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ এলে বা সেখানের আমীর কর্তৃক চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালার খবর এলে তা গ্রহণ করা হবে কিনা? সে ব্যাপারে অপর একটি হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

‘কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তাকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে পাঠালেন (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় জুমআর রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করলেন এবং নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কোন দিন নতুন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম জুমআর রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি নিজে দেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, আর লোকেরাও দেখেছে এবং তারা রোযাও রেখেছে, মুআবিয়া রাযি.ও রোযা রেখেছেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি এবং সেই হিসাবেই আমরা শেষ পর্যন্ত রোযা থাকবো, অর্থাৎ চাঁদ না দেখা গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা ২৯ তারিখে নিজেরাই চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মুআবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম হা.নং১০৮৭, মুসনাদে আহমাদ হা.নং২৭৮৯, আবূ দাউদ হা.নং২৩৩২, তিরমিযী হা.নং ৬৯৩)

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝে আসছে যে, যদি চাঁদ দেখার স্থান দূরবর্তী হয়, তাহলে সেখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে না। কারণ কুরাইব বিন আবী মুসলিম (মৃত: ৯৮হি.) একজন তাবেঈ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং ইবনে আব্বাস রাযি. এর অতিঘনিষ্ট জন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট রমযান সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি বরং তখনকার আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখা প্রামাণিত ও কার্যকর হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার সংবাদের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখার এই সংবাদ গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট সিরিয়া দূরবর্তী এলাকা গণ্য হওয়ায় তিনি সে সংবাদ গ্রহণ করলেন না বরং বলে দিলেন : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন’

এ কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইবনে আব্বাস রাযি.এর মাযহাব এটাই ছিল যে, দূরবর্তী এলাকায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ফরয হবে না। হতে পারে ইবনে আব্বাস রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ‘চাঁদ দেখে রোযা রাখো ও চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো’ এর উপর তার মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। অথবা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আদেশে আদিষ্ট হয়ে এ কথা বলেছেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উম্মতের ইজমা:

দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস আহকামুল কুরআনে লিখেন:

'আর এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে অন্যের দেখার অপেক্ষা করা ছাড়াই।' (আহকামুল কুরআন:১/৩০৫)

ইমাম জাসসাস রহ. এখানে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। যদিও এর ব্যাখ্যায় তিনি ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু মূল বিষয়টির ব্যাপারে ইজমার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. মুআত্তা মালেকের ভাষ্য গ্রন্থ 'আল ইসতিযকার'-এ লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূরবর্তী শহর যেমন খোরাসান থেকে স্পেন, এমন ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য, তবে বড় শহর হলে বা চাঁদের উদয়স্থল কাছাকাছি হলে এমন শহরের কথা ভিন্ন। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (ইসতিযকার:৩/২৮৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম ইবনে আব্দুল বারের পূর্বোক্ত ইজমার কথা উল্লেখ করে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি লিখেছেন: 'ইবনে আব্দুল বার উল্লেখ করেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এই মতানৈক্য ঐ সব এলাকার ক্ষেত্রে যেসব এলাকার চাঁদের উদয়স্থল এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেসব এলাকা দূরবর্তী যেমন খোরাসান ও স্পেন এসব এলাকার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, এমন দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।' এ কথা উল্লেখ করার কিছু পরেই তিনি এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাব বর্ণনা করে লিখেছেন: 'দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য না হওয়ার যে ইজমা ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন তা ইমাম আহমাদ রহ. এর দলীলের খেলাফ না।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন: 'ইবনে আব্দুল বার রহ. দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না মর্মে ইজমা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়।' (ফাতহুল বারী: ৪/১৫৫)

ইমাম ইবনে রুশদ বেদায়াতুল মুজতাহিদ কিতাবে লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূর দেশের ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে না। যেমন: স্পেন ও হেজাজ।' (বেদায়াতুল মুজতাহিদ নেহায়াতুল মুকতাসিদ:২/৫০)

আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী মাআরেফুস সুনানে লিখেছেন: 'শাইখ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইমাম যায়লায়ীর কথার উপর আমার সিদ্ধান্ত স্থির ছিল। পরে কাওয়ায়েদে ইবনে রুশদ কিতাবে এ ব্যাপারে ইজমার বর্ণনা পেয়েছি যে, দূরবর্তী স্থান হলে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে। আর কতটুকু দূরকে দূর বলে ধরা হবে তা অবস্থার শিকার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিবে, তার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত নেই।' (মাআরিফুস সুনান: ৫/৩৪০)

তবে এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যে দুই দেশে বা এলাকার চাঁদ দেখার তারিখ সব সময় একই হয় সে দুই দেশকে নিকটবর্তী এলাকা গণ্য করা হবে। যে সব এলাকার মধ্যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাধারণত একদিন বা ততোধিক দিনের পার্থক্য থাকে সেসব এলাকাকে দূরবর্তী শহর বা এলাকা গণ্য করা হবে। (ফাতহুল মুলহিম: ৩/১১৩, কিতাবুল মাজমূ : ৬/১৮৩)

আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেম ড. ওয়াহবা আয্যুহায়লী 'আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লতুহু' তে ও ইবনে রুশদের অনুরূপ ইজমা নকল করেছেন। (আল ফিকহুল ইসলামী : ৩/১৬৫৮)

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ইজমার কথা যখন বর্ণনা হয়েছে এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার ও ইমাম কাশ্মীরীর মত বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামও ঐ ইজমাকে অস্বীকার করেননি বরং ইবনে তাইমিয়া তো বিভিন্ন স্থানে বারবার এ কথা বলেছেন যে, এটা ইবনে আব্দুল বারের বর্ণনা করা ইজমার খেলাফ না। সুতরাং বর্ণিত ইজমাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রথম

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যুগের ইমামদের থেকে বর্ণিত মতামত হয়তো একাধিক রয়েছে অথবা মুজমাল (ব্যাখ্যা সাপেক্ষ)। সুতরাং সে মতের কারণে ইজমার উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। (মাআরেফুস সুনান:৫/৩৪৩)

যদিও মাসআলাটি মূলত মুজতাহিদ ফীহ হওয়ায় পরবর্তী উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য ও ভিন্নভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

হানাফী মাযহাব: উদয়স্থলের বিভিন্নতার সূরতে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আসহাবে মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে কোনো মতামত আমরা পাইনি। আর পরবর্তীদের মধ্যে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

ক. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং এক দূরবর্তী দেশের চাঁদ দেখা অন্য দূরবর্তী দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, নিকটবর্তী দেশ হলে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।

খ. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ চন্দ্রের উদস্থলের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে। এ মতটির প্রয়োগস্থল নিকটবর্তী এলাকা না দূরবর্তী এলাকা তা অস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাহীন।

দ্বিতীয় মতের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে প্রথম মতের স্বপক্ষে যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের হাওয়ালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ ‘আলফাতাওয়াল কুবরা’ (পৃ. ১৬)

২. ফকীহ আবুল ফাতাহ যহীরুদ্দীন আল ওয়ালওয়ালেজী ‘আল ফাতাওয়া আলওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ (১/২৩৬) তে,

৩. আল্লামা কাসানী ‘বাদায়েউস সানায়ে’ (২/৫৭৯)

৪. আল্লামা আইনী ‘শরহুল আইনি আলা কানযিদ্দাকায়েক’ (১/১৩৮)

৫. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ কিরমানী ‘জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া’ (১/৩২ : ৩৩)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৬. মোল্লা আলী কারী ‘ফাতহু বাবিল ইনায়া’ (১/৫৬৫)

৭. ফকীহ্ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়খী যাদা ‘মাজমাউল আনহুর’ (১/৩৫৩)

৮. ইমাম আব্দুল হাই লাখনাবী ‘মাজমূআতুল ফাতাওয়া’-এর রুয়াতুল হেলাল অধ্যায় (উর্দূ ১/৩৪৪)

৯. ফকীহ আলী ইবনে উসমান ‘আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ’ (৩১পৃ)

১০. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী ‘তাবয়ীনুল হাকায়েক’ (২/১৬৪)

১১. আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী ‘ফাতহুল মুলহিম’ (৩/১১৩)

১২. মুফতী শফী রহ. ‘জাওয়াহেরুল ফিকহ’ (৩/৪৩৯)

১৩. আল্লামা মুসিলী ‘আল ইখতিয়ার’ কিতাবে ‘ফাতাওয়া হুসামিয়া’ থেকে উক্ত মত বর্ণনা করেছেন। এবং তার নিজের রুজহানও সেদিকে হওয়া বুঝে আসে।

১৪. মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া উলামাউল বালাদিল হারাম পৃ.৮৮৭)

১৫. ‘মাজালিসে তাহকীকাতে শরইয়্যাহ নদওয়াতুল উলামা’-এর সিদ্ধান্তও এরূপ। (নাফায়িসুল ফিকহ:৩/১৪১)

আল্লামা ইবনুল হুমাম পূর্বে উল্লেখিত কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: ‘এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ হাদীসের অনুসরণ অধিকতর শ্রেয়, কারণ দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপারে এ হাদীসটি সুস্পষ্ট বর্ণনা। তাছাড়া এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদেরকে তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। (ফাতহুল কদীর: ২/৩১৯)

আল্লামা কাসানী রহ. লিখেছেন: (এক শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা পুরা করার সূরতে অপর শরহবাসী উনত্রিশ রোযা রাখলে একটি রোযা কাযা করবে।) ‘এটা সে ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, উদয়স্থলের পার্থক্য না হয়। আর যদি অপর শহর দূরে হয়, তাহলে এক শহরবাসীর জন্য অন্য শহরের হুকুম আবশ্যক হবে না। কারণ শহর বা অঞ্চলের মাঝে অনেক দূরত্ব হলে উদয়স্থলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের উদয়স্থলই ধর্তব্য হবে অন্যদেরটা নয়। (বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৭৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লামা ফখরুদ্দীন যায়লায়ী লিখেছেন: ‘দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া। কারণ প্রত্যেক এলাকাবাসী তাদের অবস্থা হিসাবে সম্বোধিত বা দায়িত্ব প্রাপ্ত।’ (তাবয়ীনুল হাকায়েক: ২/১৬৪)

মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন: ‘ দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া।’ (ফাতাহু বাবিল ইনায়াহ: ১/৫৬৭)

‘ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম’ গ্রন্থে উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণ করা হবে মতটি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: ‘আর এই মতটিই শব্দ ও সঠিক গবেষণার বিচারে শক্তিশালী’ (ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম পৃ.৮৮৯)

আবুল ফাতাহ ওয়াল ওয়ালেজী লিখেছেন: ‘দুই দেশের উদয়স্থল যদি ভিন্ন হয়, তাহলে এক দেশের হুকুম অন্য দেশের জন্য আবশ্যক হবে না।’ (আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালেজিয়াহ : ১/৩২৬)

দ্বিতীয় মতের বিচার বিশ্লেষণ: যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম দ্বিতীয় মত উল্লেখ করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের নাম:

১. সাহেবে খুলাসাতুল ফাতাওয়া ‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’ (১/২৪৯)

২. আল্লামা কাযী খান ‘ফাতাওয়া কাযীখান’ (১/১৯৮)

৩. ফকীহ আলম উবনুল আলা ‘তাতারখানিয়া’ (৩/৩৬৫)

৪. ইবনে নুজাইম ‘বাহরুর রায়েক’ (২/৪৭১)

৫. আল্লামা বায্যাযী ‘ফাতাওয়া বাযযায়ি’ (১/৮৬)

৬. উমর ইবনে ইবরাহীম ‘নাহরুল ফায়েক’ (২/১৪)

৭. সাহেবে ফাতাওয়া হিন্দিয়া ‘ফাতাওয়া হিন্দিয়া’ (১/১৯৮)

৮. আল্লামা শামী ‘ফাতাওয়ায়ে শামী’ (২/৩৯৩)

৯. আশরাফ আলী থানভী রহ. ‘ইমদাদুল ফাতাওয়া’ (২/১০৭)

১০. এবং ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম সহ আরো বিভিন্ন কিতাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না, এটাই জাহেরুর রেওয়ায়াহ। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলেও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। নিকটবর্তী অঞ্চল ও দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারটি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা' এ বিষয়টি মুজতাহিদ ফীহ এবং মুখতালাফ ফীহ ও বটে। 'ফাতাওয়া আল লাজনাতুত দায়িমায়' আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুর রাযযাক আফীফী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুনি স্বাক্ষরিত ফাতাওয়াতে আছে: 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য না হওয়ার মাসআলাটি মাসায়েলে নাজরিয়্যাহ, এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। আর এ মাসআলার ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা হয়েছে তাদের যাদের ইলম ও দ্বীনের ক্ষেত্রে আলাদা মর্যাদা রয়েছে। আর এটা ঐ সকল মাসায়েলের একটি যাতে ইজতিহাদ সঠিক হলে ডাবল সাওয়াব, আর ভুল হলে অর্ধেক সাওয়াব।' (প্রাগুক্ত : ১০/১০২)

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইজতিহাদের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি পরবর্তী ফকীহদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে কোনো একটি মত গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। আর মূলত এ মাসআলাটি তারজীহ বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমল করার মত একটি মাসআলা। সুতরাং কোনো 'আসহাবে তারজীহ' যেকোনো মতকে দলীলের ভিত্তিতে তারজীহ অর্থাৎ প্রাধান্য দিতে পারেন।

শেষোক্ত উলামায়ে আহনাফের ইবারাতের বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতিয়মাণ হয় যে, তারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এমতটিকে তারা জাহেরুল মাযহাব বলে দাবি করেছেন, আর জাহেরুল মাযহাব হওয়ার কারণেই এই মতটিকে তারা অন্য মতটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় হলো এই মতটি আসলেই জাহেরুল মাযহাব বা জাহেরুর রেওয়ায়াহ কিনা?

জাহেরুর রেওয়ায়াহ বা জাহেরুল মাযহাবের আলোচনাঃ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন : 'জাহেরুর রেওয়ায়হ বলা হয় ঐ সকল মাসায়েলকে যেগুলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর কিতাব মাবসূত, যিয়াদাত, জামেয়ে সগীর, সিয়ারে সগীর, জামেয়ে কাবীর, ও সিয়ারে কাবীরে পাওয়া যায়। (উসূলুল ইফতা:১১৩, উকূদু রসমিল মুফতী:৭৩)

ইখতেলাফুল মাতালে মু'তাবার না। অর্থাৎ উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে, এমন কোনো ফায়সালা আমরা জাহেরুর রেওয়ায়াহতে পাইনি (জাহেরুর রেওয়ায়াহ এর প্রায় সব কিতাবই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

খুঁজে দেখা হয়েছে)। ইমাম সারাখসী রহ. এর 'আল মাবসূত' যা জাহেরুর রেওয়ায়াহ' এর মাসআলা-মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত সংকলন এবং 'কাফী'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানেও এরূপ কোনো কথা পাওয়া যায়নি। এমনকি নাদিরুর রেওয়ায়াতেও এমন কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং হানাফীদের কোনো গ্রন্থে 'ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না' এটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা এবং এ শুধু এ কারণে এই মতকে তারজীহ দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখা উচিত। অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো একটি মাসআলা কারো দিকে নিসবত করা হয়, পরবর্তীরাও তার অনুসরণ করে নিজের কিতাবে তা উল্লেখ করে দেয়। কিন্তু আসল কিতাব পুনরায় নিরীক্ষণ করলে তা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. শরহু উকূদি রসমিল মুফতীতে এ বিষয়ে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী পৃ.৫৮)

এই মাসআলাটির উৎস:

নাদিরুর রেওয়ায়াহতে একটি মাসআলা পাওয়া যায় যার থেকে চাঁদের মাসআলাটি মুসতাম্বাত বা বের হতে পারে। আহকামুল কুরআনসহ কয়েকটি কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 'বিশর বিন ওয়ালীদ আবূ ইউসুফ রহ. থেকে এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ., থেকে আমাদের আসহাবদের কারো মতোবিরোধ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন যে, যখন কোনো শরহবাসী চাঁদ দেখে উনত্রিশ দিন রোযা রাখে, আর ঐ শহরে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলো না, তার হুকুম হলো সুস্থ হওয়ার পর সে উনত্রিশটি রোযাই কাযা করবে। আর যদি কোনো অঞ্চলের লোক চাঁদ দেখে ত্রিশটি রোযা রাখে আর অপর অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝে আসে যে, যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তাদের জন্য একটি রোযা কাযা করা জরুরী। আর ঐ শহরের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ত্রিশটি রোযা কাযা করতে হবে। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস : ১/৩০৩)

ইমাম জাসসাস আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে যে দুইটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন সম্ভবত তার দ্বিতীয়টি থেকে ইখতেলাফে মাতালের মাসআলাটি ছাবেত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রাখল আর অপর শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল, তাহলে যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা একটি রোযা কাযা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করবে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের উপর ঐ শহরবাসী যারা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের চাঁদ দেখার কারণেই একটি রোযা কাযা করতে হবে। অতএব, এর দ্বারা বুঝা গেল অপর শহরবাসীর চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ফলে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার নয় সাব্যস্ত হলো অর্থাৎ উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাপারে ইমাম জাসসাস বলেছেন: 'পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝা যায় যে যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তারা একটি রোযা কাযা করবে।' এর দ্বারা বুঝা গেল দ্বিতীয় মাসআলাটি প্রথম মাসআলা থেকে ইস্তিম্বাত বা বের করা হয়েছে, এটি মানসূস আলাইহি কোনো মাসআলা না।

২. বর্ণিত মাসআলায় দুই শহরের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন নাকি এক, এ ব্যাপারে কোনো কিছুই উল্লেখ নাই। তাই এ মাসআলা থেকে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না, এ কথা প্রমাণ করা অসম্ভব।

৩. তাছাড়া এ মাসআলাটি 'মুহীতে বুরহানী' এবং 'তাতারখানিয়াতে' 'মুনতাকা'-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুনাতাকার ব্যাপারে কাশফুযযুনূর এর লেখক লিখেছেন: 'আল মুনতাকা ফী ফুরূইল হানাফিয়্যাহ হাকেম শহীদ রহ. এর লেখা। এতে মাযহাবের নাওয়াদিরুর রেওয়ায়হ সন্নিবেশিত হয়েছে।' (কাশফুয যুনূন:১৮৫১)

অতএব, যে বর্ণনার মধ্যে মাতালে বা উদয়স্থলের ভিন্নতা সত্ত্বেও চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কোনো আলোচনাই নেই এবং যেটা নাদিরুর রেওয়ায়াহ সন্নিবেশিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সেটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা কি করে বৈধ হতে পারে?

তাই আমরা বলতে পারি যে, ইখতেলাফে মাতালে মু'তাবার না, এই মাসআলাটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করে, জাহেরুর রেওয়ায়াহ হওয়ার কারণেই তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমাদের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, এই মতটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আসহাবে মাযহাবের মতের ব্যাপারে আমরা তাই বলতে চাই যা ইউসুফ বান্নুরী রহ. বলেছেন। তিনি বলেন: 'প্রকাশ থাকে যে, মাযহাবের উলামাদের থেকে শুধু এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না। কাছের এলাকার বা দূরের এলাকার অথবা অন্যকোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া তাদের থেকে এই এজমালী কথা পাওয়া যায়... এ দিকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং আইম্মা কেরামের মুতলাক (ব্যাখ্যা ছাড়া) কথাকে, নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য না, এরূপ শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা আবশ্যক। আমাদের শায়েখ আল্লামা কাশ্মীরী এটাই বলতে চেয়েছেন।' (মাআরিফুস সুনান:৫/৩৪১:৪২)

এখন আর হানাফীদের দুই প্রকার মতের ক্ষেত্রে কোনো সংঘর্ষ থাকল না। শুধু এতটুকু পার্থক্য থাকলো যে, একটি মত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, আরেকটি মত যেটির আলোচনা আমরা শেষে করেছি সেটি অস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মতটির ব্যাখ্যা করার পর প্রথম মতটির সাথে এর কোনো সংঘর্ষ বাকি থাকে না।

প্রিয় পাঠক! আশা করি আমাদের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা পড়ার পর আপনার বুঝতে বাকী নেই যে, নিকটবর্তী এলাকার কোনো এলাকায় চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে দূরবর্তী এলাকার হুকুম ভিন্ন। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে এক অঞ্চল বা দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকা নিজেদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ পালন করবে। উল্লেখিত মাসআলাটি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের একক সিদ্ধান্ত নয়। বরং মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এটিই। সুতরাং এ মাসআলার ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মতের আমল যেভাবে চলে আসছে তাই সহীহ এবং দলীল প্রমাণ সমর্থিত আর ইজমাও এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মাসআলার বিরোধিতা করে নতুন কোনো আমল চালু করা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতার নামান্তর।

সুতরাং আমাদের দেশের গুটিকয়েক বিদআতী ও ফেতনা সৃষ্টিকারী নামধারী আলেমদের কথা শুনে ও তাদের লেখা পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের কথা অনুযায়ী সৌদী আরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম দায়েম রাখুন। আমীন।

দ্বিতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসের রোযা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা পালনের পর শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল।

প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখে, সে যেনো পূর্ণ এক বছর (৩৬০ দিন) রোযা রাখার সমান সওয়াব লাভ করে। (মুসলিম ১১৬৪, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।)

এই সওয়াব এই জন্য যে, উম্মতে মুহাম্মাদির যে কেউ একটি ভালো কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে সে তার ১০ গুণ সওয়াব পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে।" (সুরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬০)

অতএব, এই ভিত্তিতে ৩০+৬ = ৩৬টি রোযা রাখলে ৩৬×১০ = ৩৬০ অর্থাৎ চন্দ্র মাস অনুযায়ী সারা বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, শাউয়াল মাসে রোযা রাখার তাৎপর্য অনেক। রমযানের পর শাউয়ালে রোযা রাখা রমযানের রোযা কবুল হওয়ার আলামত স্বরূপ। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার আমল কবুল করলে, তাকে পরেও অনুরূপ আমল করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। নেক আমলের প্রতিদান বিভিন্নরূপ। তার মধ্যে একটি হলো পুনরায় নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করা। তাই নামাজ রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বাকি এগার মাসেও চালু রাখা চাই। কেননা যিনি রমযানের রব, বাকি এগার মাসের রব তিনিই।

তিনি আরো বলেন, তবে ইবাদতের মোকাবেলায় গুনাহের কাজ করলে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অতএব, কোন ব্যক্তি রমযানের পরপরই হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে, তার সিয়াম স্বীয় মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এবং রহমতের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।
গুনাহের পর ভাল কাজ করা কতইনা উৎকৃষ্ট আমল। কিন্তু তার চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট আমল হলো নেক কাজের পর আরেকটি নেক কাজে মশগুল হওয়া। অতএব, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, যাতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন। সাথে সাথে অন্তর বিপথে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ চাও। কেননা আনুগত্যের সম্মানের পর নাফরমানির বেইজ্জতি কতইনা নিকৃষ্ট।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, রমযানের রোযা দশ মাসের রোযার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোযা দু'মাসের রোযার সমান। সুতরাং এ হলো এক বছরের রোযা।

অপর রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা শেষ করে শাউয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখবে সেটা তার জন্য পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (সূরা আন'আম আহমদ : ৫/২৮০, দারেমি : ১৭৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শাউয়াল মাসের ৬ রোযা রেখে সারা বছর রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তৃতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসে বিবাহ করা

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "বান্দা যখন বিবাহ করল তখন তার দ্বীনদারী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।" (মিশকাত শরীফ - ২৬৭)

মানুষের অধিকাংশ গুনাহ দুটি কারণে সংঘটিত হয়। একটি হয় তার লজ্জা স্থানের চাহিদা পূরণের কারণে আর অন্যটি হয় পেটের চাহিদা পূরণের কারণে। বিবাহের কারণে মানুষ প্রথমটি থেকে হেফাজতের রাস্তা পেয়ে যায়। সুতরাং তাকে কেবল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকতে হয়। যাতে করে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারে। একজন লোক খুব বড় আবেদ, তাহাজ্জুদ-চাশত-আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায খুব পড়ে; কিন্তু সংসারের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আরেকজন লোক ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করে এবং বিবি বাচ্চার হক আদায়ে তৎপর থাকে ফলে তার বেশী বেশী নফল পড়ার কোন সময় হয় না। এতদসত্ত্বেও শরী'আত কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই ইবাদাতগুজার হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত মুতাবিক বিবাহ-শাদী করে পরিবারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হালাল রিযিকের ফিকির করছে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল যে চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদে পড়ে থাকে বা বনে জঙ্গলে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে আর সব রকমের সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিবাহের অন্যতম আরো একটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা রাসূলে আকরাম ﷺ এর নির্দেশ পালন করা হয়। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ "বিবাহ করা আমার সুন্নাত।" আরেক হাদীসে এসেছেঃ" তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বিবাহ কর। কারণ এর দ্বারা দৃষ্টি ও লজ্জা স্থানের হেফাজত হয়।" (মিশকাত শরীফ- ২৬৭ পৃঃ)

এছাড়াও বিবাহের দ্বারা মানুষ নিজেকে অনেক গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আওলাদ হাসিল করতে পারে। আর নেক আওলাদ এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরে কঠিন অবস্থার উত্তরণে পরম সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। কারো যদি নেক সন্তান থাকে তাহলে তারা যত নেক আমল করবে, সেগুলো পিতা-মাতার আমলে যোগ দেয়া হবে। বিবাহ-শাদী যেহেতু শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত, সেহেতু এর মধ্যে কোনভাবে গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কোন সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া এতে বেপর্দা, নাচ-গান, অপব্যয়-অপচয়, ছবি তোলা, নাজায়িয দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে দুরে থাকতে হবে। নতুবা মুবারক বিবাহের সমস্ত বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সূচনাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ- ২/২৬৮)

বিবাহ সম্পর্কিত কিছু হাদীস

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ পাক আবশ্যক মনে করেন –

(১) ঐ মুকাতাব বা দাস যে নিজের মুক্তিপণ আদায় করতে চায়।
(২) ঐ বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং
(৩) ঐ মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত- ২৬৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার আভিজাত্যের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অপমান ও অপদস্থতা অধিক হারে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তাকে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দারিদ্রতাকে (দিনে দিনে) বৃদ্ধি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার বংশ কৌলীন্য দেখে, আল্লাহ তা'আলা তার তুচ্ছতা ও হেয়তা বাড়িয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে শুধুমাত্র এই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

জন্য বিবাহ করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জা স্থানকে হেফাজত করবে অথবা (আত্মীয়দের মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনেই বরকত দান করবেন। (তাবারানী)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দ্বীনদারীর কারণে। সুতরাং তুমি দ্বীনদার বিবি লাভ করে কামিয়াব হও। তোমাদের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও (যদি দ্বীনদার ব্যতীত অন্য নারী চাও)। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-২৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নেককার বিবি। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত- ২৬৭)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনদারী ও আখলাক তোমরা পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও। (মাল সম্পদের প্রতি লক্ষ্য কর না) তা যদি না কর তাহলে দেশে ব্যাপকহারে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ- ২৬৭)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ সর্বাপেক্ষা বরকতর্পূণ বিবাহ হলো, যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পাদিত হয়। (বাইহাকী, মিশকাত শরীফ- ২৬৮)

বিবাহের স্থান ও কাল

বিবাহের জন্য উত্তম হলো জুমু'আর দিন। পঞ্জিকায় যে শুভ অশুভ সময় লেখা আছে, সেটা হিন্দুদের তরীকা। শরী'আতের দৃষ্টিতে যে কোন মাসে, যে কোন দিনে এবং যে কোন সময়ে বিবাহ বৈধ। তবে শাউয়াল মাসে এবং জুম'আর দিনে বিবাহ করা সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মুসলমানদের বিবাহ মসজিদেই সম্পন্ন হত। আর এটা নবীজীর সুন্নাতও বটে। শাউয়াল মাসে বিবাহ করা আরেকটি সুন্নাত। সুতরাং কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে শাউয়াল মাসের জুমু'আর দিনে বিবাহ করবে। আর সম্ভব না হলে অন্য যে কোন সময়ে করতে পারে। তবে সম্ভব হলে মসজিদ ও জুমু'আ ঠিক রাখবে, এটাও সম্ভব না হলে দুটোর কোন একটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ খায়ের ও বরকত থেকে মাহরুম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদের বিবাহে সুবিধা হলো, এতে কোন ফালতু খরচ হয় না। বিছানা-পত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দাবী-দাওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের জায়গা, সেখানে মানুষ ইবাদত করতে আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করতে আসে। কাজ শেষ হলেই চলে যায়। (মিশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৩/২৬৫)

বিবাহ-শাদীর প্রচলিত ভুলসমূহ

বিবাহ-শাদী মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নে'আমত হিসাবে দান করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবাহ-শাদী দুনিয়াবী কাজ বা মুবাহ মনে হলেও যথা নিয়মে সুন্নাত তরীকায় যদি তা সম্পাদন করা হয় তাহলে সেটা বরকতপূর্ণ ইবাদত ও অনেকে সওয়াবের কাজ হয়। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিবাহ-শাদী সুন্নত তরীকায় তো হয়ই না। উপরন্তু এটা বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথা এবং বড় বড় অনেক গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলছে। এজন্য নিম্নে বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত কিছু ভুল এবং কুপ্রথা তুলে ধারা হল। যাতে এগুলো থেকে বাঁচা হয়।

বিবাহের পূর্বের ভুলসমূহ

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং এখানে দীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়াদারগণ সৌন্দর্য, মাল, দৌলত ও খান্দানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এটা রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত হওয়ায় শান্তি বয়ে আনে না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

২. কোন কোন জায়গায় অভিভাবক এবং সাক্ষী ছাড়া শুধু বর কনের পরস্পরের সন্তুষ্টিতেই বিবাহের প্রচলন আছে। অথচ এভাবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না। বরং এটি যিনা-ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি না থাকে, আর ছেলে মেয়ের "কুফু" তথা দীনদারী, মালদারী ও পেশাগত দিক থেকে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে সে বিবাহও শুদ্ধ হয় না।

৩. কেউ কেউ ধারণা করে যে মাসিক চলাকালীন সময় বিবাহ শুদ্ধ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ অবস্থায় সহবাস জায়িয নেই।

৪. কেউ কেউ ধারণা করে যে মুরীদনীর সাথে পীর সাহেবের বিবাহ জায়িয নেই। অথচ রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ সকলেই তাঁর মুরীদনী ছিলেন।

৫. অনেকে অনেক বয়স হওয়ার পরও বিবাহ করে না কিংবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর বা সে মৃত্যু বরণ করার পর আর ২য় বিবাহ করে না। অথচ শারীরিক বিবেচনায় তার বিবাহ করা জরুরী ছিল। এ অবস্থায় থাকা মানে যিনা-ব্যভিচারে জড়িত হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়া।

৬. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় (উদাহরণ স্বরূপ) ৬০ বছরের বয়স্ক লোক অল্প বয়সী যুবতী মেয়েকে বিবাহ করে বসে। ফলে ঐ মেয়ে নিশ্চিত জুলুমের শিকার হয়।

৭. অনেকে স্ত্রীর খেদমতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতা লুকিয়ে লোক দেখানোর জন্য বিয়ে করে স্ত্রীর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

৮. কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত লোক আধুনিক শিক্ষা তথা ডাক্তারি প্রফেসারি ইত্যাদি ডিগ্রি দেখে মেয়ে বিয়ে করে। তাদের ভাবা উচিৎ বিয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য কী? যদি তার স্ত্রীর দ্বারা টাকা কামানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা তো বড় লজ্জাজনক কথা যে, পুরুষ হয়ে মহিলাদের কামাইয়ের আশায় বসে থাকবে। মনে রাখতে হবে এধরণের পরিবারে শান্তি আসে না।
৯. কেউ কেউ পালক পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রী বিবাহ করাকে না জায়িয মনে করে। এটা জাহিলী যুগের বদ-রুসূম।

১০. কেউ কেউ বিধবা মহিলাদের বিবাহ করাকে অপছন্দ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী বিধবা ছিলেন। (বুখারী হাঃ নং ৫০৭৭)

বিবাহের সময়ের ভুলসমূহ

বর পক্ষের ভুলসমূহ

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং বিবাহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার গুনাহ না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে খায়ের বরকত লাভ হবে। যদি বিবাহকে গুনাহ মুক্ত করা না যায় তাহলে সেখানে অশান্তি হওয়া নিশ্চিত। ২. প্রথাগতভাবে অনেক লোকের বর যাত্রী হিসেবে যাওয়া। ৩. দাওয়াতকৃত সংখ্যার অধিক লোক নিয়ে যাওয়া। ৪. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কন্যার জন্য যৌতুক পাঠানো এবং এটাকে জরুরী মনে করা। ৫. গায়রে মাহরাম পুরুষ দ্বারা মেয়ের ইজন বা অনুমতি আনা। ৬. বেগানা পুরুষদের কন্যার মুখ দেখা এবং দেখানো। ৭. নাচ-গান, বাজনা ইত্যাদি করা। ৮. সালামী গ্রহণ করা। ৯. মোহরানা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূর্বেই না করা, বরং করাকে দোষ মনে করা। অতঃপর বিবাহের সময় তর্ক-বিতর্ক করা। ১০. লোক দেখানোর জন্য বা গর্বের সাথে ওলীমা করা। ১১. মোহরানার বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া এবং মোহরানা আদায়ে গাফলতী করা। ১২. ইচ্ছাকৃত এমন কর্মকাণ্ড করা যে কারণে কোন পক্ষের অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হয় অথবা তাদের অস্থিরতার কারণ হয়। আর নিজেদের সুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. বিবাহ অনুষ্ঠানের কারণে ফরয ওয়াজিবসহ শরী‘আতের বিধানের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করা।

কন্যা পক্ষের ভুলসমূহ

১. বর যাত্রার চাহিদা। ২. ছেলের জন্য উপঢৌকন/যৌতুক প্রকাশ্যে পাঠানো, পাঠানোকে পছন্দ করা এবং জরুরী মনে করা। ৩. আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসীদের জন্য প্রথাগত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। ৪. বিবাহের সরঞ্জাম, অলংকারাদী প্রকাশ্যে দেখা এবং অন্যদেরকে দেখানো। ৫. বিবাহের পর রুসূম হিসাবে জামাতাকে শরবত পান করানো। ৬. বেগানা মহিলারা জামাতার সামনে আসা। ৭. সালামী গ্রহণ করা। এটাকে জরুরী মনে করা এবং নেয়া দেয়া। ৮. যাতে মহল্লায় খুব প্রসিদ্ধ হয় সে জন্যে ইচ্ছাকৃত কোন কিছু করা। ৯. ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হওয়া। এছাড়াও বিবাহ উপলক্ষে অনেক বেপর্দা, যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা, অপব্যয়, ছবি এবং ভিডিও ইত্যাদি করা হয়, যাতে বিবাহের সকল খায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিবাহের কিছু কুপ্রথা

১. মেয়ের ইজন আনার জন্য ছেলেপক্ষ স্বাক্ষী পাঠিয়ে থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে এর কোন প্রয়োজন নেই।

২. বিবাহের সময় অনেকে বর-কনের দ্বারা তিনবার করে ইজাব কবূল পাঠ করিয়ে থাকে এবং পরে তাদের দ্বারা আমীন বলানো হয়। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

৩. ইজাব কবূলের মাধ্যমে আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজলিসে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে সামনে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে বর যে সালাম করে থাকে তারও কোন ভিত্তি নেই।

৪. ঝগড়া-ফাসাদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও খেজুর ছিটানোকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম যঈফ বলেছেন।

বিবাহ শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার

১. অনেক জায়গায় বিবাহ রওয়ানা হওয়ার আগে এলাকার প্রসিদ্ধ মাযার যিয়ারত করে তারপর রওয়ানা হয়। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

২. বরের নিকট কনে পক্ষের লোকেরা হাত ধোয়ানোর টাকা, পান পাত্রের পানের সাথে টাকা দিয়ে তার থেকে কয়েকগুণ বেশী টাকা জোর যবরদস্তী করে আদায় করে থাকে। এটা না জায়িয।

৩. অনেক জায়গায় গেট সাজিয়ে সেখানে বরকে আটকে দেয়া হয় এবং টাকা না দেয়া পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটাও একটা গর্হিত কাজ।

৪. খাওয়া দাওয়া শেষে কনে পক্ষের লোকেরা বরের হাত ধোয়ায়। পরে হাত ধোয়ানো বাবদ টাকা দাবী করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এটা একেবারেই অনুচিত। মূলতঃ এসব হিন্দুয়ানী প্রথা। দীর্ঘ দিন যাবত হিন্দুদের সাথে বসবাস করার কারণে আমাদের মধ্যে এই কুসংস্কারগুলি অনুপ্রবেশ করেছে।

৫. বিবাহ পড়ানোর আগে বা পরে যৌতুকের বিভিন্ন জিনিস-পত্র প্রকাশ্য মজলিসে সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটাও অন্যায় ও নির্লজ্জতার কাজ।

৬. বিবাহের পরে নারী-পুরুষ সকলের সামনে কনের পিতা বা মাতা জামাই-মেয়ের হাত একসাথে করে তাদেরকে দু'আ দেয়। কনের পিতা জামাইকে বলে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

“আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম, তুমি এক দেখে শুনে রেখ” এর কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

৭. বিবাহ করে আনার পর শ্বশুর বাড়ীতে নববধূকে বিভিন্ন কায়দায় বরণ করা হয়। কোথাও ধান, দুবলা ঘাস, দুধের স্বর ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয় এবং নববধূর চেহারা সকলকে দেখানো হয়; এসবই হিন্দুয়ানী প্রথা। কোন মুসলমানের জন্য এসব করা জায়িয নেই।

৮. অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ের আগের দিন আর কোথাও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পরের দিন মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে মাছ-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে। কোথাও এটাকে চৌথি বলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজায়িয প্রথা।

৯. বর বা কনেকে কোলে করে গাড়ী বা পালকী থেকে নামিয়ে ঘরে তোলাও চরম অভদ্রতা বৈই কিছু নয়।

১০. ঈদের সময় বা অন্য কোন মৌসুমে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে চাল, আটা, ময়দা, পিঠা ইত্যাদি পাঠানো এবং এ প্রচলনকে জরুরী মনে করার প্রথা অনেক জায়গায় চালু আছে। আবার অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামাইকে এবং তার ভাই-বোনদেরকে কাপড়-চোপড় দেয়ার প্রথা আছে। এমনকি এটাকে এতটাই জরুরী মনে করা হয় যে, ঋণ করে হলেও তা দিতে হয়। এটা শরী‘আতের সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়।

১১. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠানে বেগানা মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে নিজেকে বিকশিত করে একত্রিত হতে দেখা যায় এবং যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা করতেও দেখা যায়। এধরনের বেপর্দা আর বেহায়াপনার কারণে উক্ত মজলিসে উপস্থিত নারী পুরুষ সকলেই গুনাহগার হবে।

১২. বিবাহ উপলক্ষে গান-বাজনা, ভিডিও, ভিসিআর ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। আর কোন কোন এলাকায় তো যুবতী তরুণী মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ গানও করে থাকে। শরী‘আতের দৃষ্টিতে এসব হারাম ও নাজায়িয।

১৩. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠান মানেই গুনাহের ছড়াছড়ি। এমন এমন গুনাহ সেখানে সংঘটিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি তোলা ও ভিডিও করা। শরী‘আতের দৃষ্টিতে কোন প্রাণীর ছবি তোলা চাই ক্যামেরার মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও এর মাধ্যমে হোক বা অংকন করা হোক সবই হারাম।

১৪. বিবাহের পরে মেয়েকে উঠিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে মেয়ের বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা একত্রিত হয়, আর বরকে অন্দর মহলে এনে সকলে মিলে হৈ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হুল্লা করে তার মুখ দর্শন করে। মেয়েরা হাসি মজাক করে বিভিন্ন উপায়ে নতুন দুলাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। আর নির্লজ্জ হাসি তামাশায় মেতে উঠে। এধরনের বেপর্দেগী শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

১৫. অনেক জায়গায় প্রথা চালু আছে যে, নববধূকে বর নিজে বা তার ভগ্নীপতি অথবা তার ছোট ভাই পালকী বা গাড়ী থেকে নামিয়ে কোলে করে ঘরে নেয়। তারপর উপস্থিত মহল্লাবাসীর সামনে নববধূর মুখ খুলে দেখানো হয়। এ সকল কাজ হারাম এবং নাজায়েয।

বিবাহের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের দা.বা. "ইসলামী বিবাহ" কিতাবটি।

বি.দ্র. কেউ যদি শাউয়াল মাসের নিকটবর্তী সময়ে বিবাহ করার জন্য তৈরী থাকে তবে তার জন্য পারমর্শ হলো সে যেন শাউয়াল মাসের অপেক্ষা করে কিন্তু কারো বিবাহ যদি ২/৩ মাস আগে বা পরে ঠিক হয় তবে তার জন্য শাউয়াল মাস অপেক্ষা না করে তাৎক্ষনিক বিবাহ করা উচিত।

চতুর্থ আমলঃ শাউয়াল মাসে হজ্জের প্রস্তুতি

এই মাসের আরেকটি আমল বা কাজ হলো হজ্জের প্রস্তুতি নেয়া। হজ্জের জন্য যারা নিয়ত করেছে তাদের কাজ হলো তারা যেন হজ্জের যাবতীয় মাসআলা মাসাইল শিক্ষা করে।

হজ্জের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের দা.বা. "কিতাবুল হাজ্জ" কিতাবটি, নিজের কাছে রাখতে পারেন।

পঞ্চম আমলঃ শাউয়াল মাসে বড় আলেম হওয়ার প্রস্তুতি

যারা বড় হাফেয-আলেম হতে চায়, বড় মুফতী, শাইখুল হাদীস, মাওলানা-মুহাদ্দিস হতে চায়, বড় আল্লাহওয়ালা শায়েখ হতে চায়, কুরআন-হাদীসে পারদর্শী হতে চায় তাদের সকলের ইলমী সবকের শুরু হয় এই শাউয়াল মাসে। সারা পৃথিবীর সমস্ত কউমী মাদরাসাগুলোতে এই মাসে সবক শুরু হয়। কুরআন নাযিল হয়েছে রমযান মাসে আর তার পরের মাসেই অর্থাৎ এই শাউয়াল মাসে সবক শুরু।

শাউয়াল মাসের শিক্ষাঃ সুহবাত

শাউয়াল মাসের শিক্ষা হলো সুহবাত। রমযান মাসের সুহবাতের কারণে শা'বান মাস এবং এই শাউয়াল মাস এতো দামী হয়েছে। সুহবাতের কারণে এই মাসকে "শাউওয়ালুল মুকাররম" বলা হয়। ঠিক তেমনি নেক লোকের সুহবাতের কারণেই মানুষও দামী হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সংসর্গে থাকো। (সূরা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১)

হযরত হানযালা রাযি. (একটি দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেন, আমরা যখন আপনার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) পবিত্র খেদমত হতে চলে আসি, তখন পরিবার-পরিজন, কাজ-কারবার ও সম্পত্তির মধ্যে ডুবে যাই এবং অনেক বিষয়ের খেয়ালও থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সেই সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যে অবস্থায় তোমরা আমার নিকট থাকো, যদি এই অবস্থা বা যিকিরে নিমগ্নতা স্থায়ী হয়, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় এবং পথে মুসাফাহা করতে থাকবে। কিন্তু হে হানযালা! কেমন একেকটি মুহূর্ত! কেমন একেকটি মুহূর্ত! তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন।' (মুসলিম-৭১৪২ ও তিরমিযী)

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আলেম ছিলেন না, কিন্তু (সাধারন সাহাবীর মর্যাদাও সর্বোচ্চ শ্রেনীর মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং বড় বড় ওলী-কুতুবের উপর স্বীকৃত। এই মর্যাদা নির্ভর করে একমাত্র নবীজীর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের উপর) তাঁরা যা কিছু লাভ করেছেন, তা শুধু মহানবী ﷺ-এর সংসর্গের মাধ্যমেই পেয়েছেন। আল্লাহ্ওয়ালাগণ সদা-সর্বদা সুহবত বা সাহচর্যকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য মনে করেছেন। তাঁরা ইলমের প্রতি এতো মনোযোগ দেননি যতটুকু মনোযোগ দিয়েছেন সংসর্গের প্রতি।

অনেক ইলমওয়ালা লোক, কোন বড় আল্লাহর ওলীর সুহবাতে যায়নি, তিনিও গোমরাহ হয়েছেন বা দ্বীনের খেদমতে তেমন আঞ্জাম দিতে পারেন নি। অপরদিকে সাধারন লোক বড় আল্লাহর ওলীর সুহবাতে গিয়ে এমন দামী হয়েছেন যে পরবর্তীতে বড় বড় আলেম উনার সুহবাতে থাকতে পারা সৌভাগ্য মনে করেছেন। যেমন বর্তমানে (১৪৩৭ হিঃ) পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আলেম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা দারুল

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

উলুম করাচীর মুহতামিম সাহেব মুফতী রাফী উসমানী দা.বা., উভয়েই যার সুহবাতকে সৌভাগ্যের আলামত ভেবেছেন তিনি ছিলেন একজন সাধারন লোক। নাম, ডাঃ আব্দুল হাই রহ.। এই ডাঃ আব্দুল হাই রহ., গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সুহবাতে থেকে নিজেকে এত দামী বানিয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার সমস্ত আলেম উনাকে ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী হিসেবে জানেন। সুহবাতের বরকতে তিনি আরিফ বিল্লাহ হিসেবে খ্যাত। এমন বহু মানুষ সুহবাতের মাধ্যমে দামী হয়েছেন এবং হচ্ছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেন, "সঙ্গ গুণে রঙ্গ আসে।" তাই আমাদের জন্য জরুরী হলো নেক লোকের সুহবাতকে গণিমত মনে করে তাদের সাথে উঠাবসা করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন ।

যিলক্বদ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

যিলক্বদ মাসে কোন ইবাদত আল্লাহ রাখেন নি। নামাযের প্রস্তুতি যেমন উযু ঠিক তেমনি যিলহাজ্জের প্রস্তুতি হলো যিলক্বদ। এই মাস ইবাদাত শিখার জন্য রাখা হয়েছে। উলামাদের নিকট থেকে যিলহাজ্জ মাসের করণীয় বিষয়গুলো কিভাবে করতে হবে তা শিখতে হবে। এবং যিলহাজ্জ মাসের যে ইবাদত রয়েছে তার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে তা জেনে তা থেকে নসীহত হাসিল করতে হবে। যেমনঃ বাইতুল্লাহ কিভাবে পূনঃনির্মান হলো তার ঘটনা পুরোটা সামনে আসবে। তারপর হজ্জের ঘটনা, কুরবানীর ঘটনা ইত্যাদি। ইতিহাস জানতে আমরা যে সকল কিতাব পড়বো তা কোন ভালো আলেম থেকে পরামর্শ করে কিতাব সম্পর্কে জেনে নিবো। নিম্নে হাজ্জ এবং কুরবানীর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে এবং তা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো দেয়া হলোঃ

হজ্জ এবং কুরবানীর ঘটনা

হযরত ইবরাহীম আ. প্রিয় জন্মভূমি, পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজন ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব সহ নিজের সব কিছু পরিত্যাগ করে ছিয়াশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে কেনানে অনেকটা আপনজনহীন জীবন-যাপন করছিলেন। আর এতোকাল পর্যন্ত তাঁর ঔরসে কোন সন্তান জন্মে ছিল না। এজন্য তখন তিনি আল্লাহ পাকের নিকট সন্তান কামনা করে দু'আ করলেন। তাঁর মুনাজাত কবুল হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক ধৈর্যশীল সুসন্তানের শুভ সংবাদ দিলেন। সে অনুযায়ী

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কিছুদিন পর হযরত হাজেরার রা. গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল-ইসমাঈল।

কেনানে অবস্থানকালে হযরত ইসমাঈল যখন দুগ্ধ পোষ্য শিশু, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে হযরত ইবরাহীমের আ. প্রতি নির্দেশ এলো-বিবি হাজেরা রা. সহ কলিজার টুকরো একমাত্র ছেলে সন্তান হযরত ইসমাঈল আ. কে আরবের মরু প্রান্তরে নির্বাসনে রেখে আসতে। এ মহা পরীক্ষার মুখে সামান্যতম বিচলিত না হয়ে নির্দ্বিধায় তিনি স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে মক্কার সেই জন-মানবহীন মরু ভূমিতে সামান্য কিছু খেজুর আর অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে রেখে এলেন। কিছু দিনের মধ্যে। সেই সামান্য খেজুর ও পানিটুকু শেষ হয়ে গেলে। পানির পিপাসায় কাতর-তৃষ্ণার্ত ছেলের করুণ অবস্থা দেখে হযরত হাজেরা রা. পানির সন্ধানে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। সাফা-মারওয়া তার সেই দৌঁড়াদৌড়ি আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয়েছিল যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে হজ্বের আহকামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সেই ইতিহাস চির অম্লান করে রেখেছেন। আর হযরত হাজেরা রা. পানি না পেয়ে ফিরে এসে অতীব বিস্ময়ে দেখতে পেলেন- হযরত ইসমাঈলের আ. পায়ের গোড়ালির নিকট হতে মাটি ফেটে পানি উথলিয়ে উঠছে। জিবরাঈল আ. তার বাজু দিয়ে আঘাত করেছিলেন। ঐ আঘাতে তার পায়ের থেকে পানির ফোয়ারা বের হয়ে এই যমযম কুপের আবিষ্কার হয়েছে। এই পানিকেই যমযমের পানি বলে। যমযমের পানি হাউসে কাউসার পানি থেকে বেশী বরকতময়। এই জন্য মিরাজে নেয়ার আগে রাসূল সা. এর সিনা চাক করার সময় জিবরাঈল আ. জান্নাত থেকে সব জিনিসই এনে ছিলেন কিন্তু পানি আনেন নি। যমযমের পানি ব্যবহার করে ছিলেন। এই পানি যেকোন বান্দা যে কোন নিয়তে পান করবে আল্লাহ তা পূরণ করবেন। এই পানিতে পানি ও আছে খানাও আছে। এই পানিতে যত পানি মিশানো হোক তার বরকত কমবে না। এই পানি কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। এর লেবেল কখনো কমবে না। তা-ই আজ যমযম কূপ নামে অভিহিত। হযরত ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী পুত্র আরবের সেই মক্কা-মরু নির্জন অঞ্চলে থাকতেন। আর হযরত ইবরাহীম আ. থাকতেন সিরিয়ার কেনানেই। মাঝে মাঝে মক্কায় এসে তিনি তাঁদেরকে দেখে যেতেন।

একবারের ঘটনা, হযরত ইবরাহীম আ. মক্কা এলেন। তখন ইসমাঈল আ. সবেমাত্র কৈশোর পেরিয়ে তের বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে এদিক সেদিক আসা-যাওয়া এবং পিতার বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে তাঁকে সহায়তা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছেন, বা মতান্তরে তিনি তের বৎসরের হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে শিখেছেন, তখন হযরত ইবরাহীম আ. একদিন স্বপ্নে দেখলেন

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যে, হযরত ইসমাঈলকে আ. স্ব হস্তে যবেহ করছেন। সকালে ঘুম হতে উঠে সারা দিন তিনি এ চিন্তায়ই মগ্ন রইলেন যে, এ স্বপ্ন সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে দেখানো হয়েছে, নাকি শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝেই তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ রাতেও আবার একই স্বপ্ন দেখলেন। কারো কারো মতে তৃতীয় রাতেও আবার একই স্বপ্ন দেখলেন। পরপর দুই বা তিন রাতে একই স্বপ্ন দেখার পর এবার তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতেই। আর নবীদের স্বপ্ন যেহেতু ওহী তথা আল্লাহ তা'আলার আদেশরূপে গণ্য হয়ে থাকে, সেহেতু এ স্বপ্নের মর্মার্থ এটাই ছিল যে, "হে ইবরাহীম! তুমি তোমার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী (যবেহ) করে আমার নামে উৎসর্গ করে দাও।" সে মুতাবেক হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর আদেশ পালনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে খোদার আদেশ পালনের ব্যাপারে তাঁর সন্তানের মনোভাব জানবার জন্য স্বপ্নের কথা উল্লেখ করত: তাঁর অভিমত চাইলেন। হযরত ইসমাঈল আ. কে আল্লাহ তা'আলা এ ছোট বয়সেই যে ইল্‌ম ও বুঝশক্তি দিয়েছিলেন, তার গুণে স্বপ্ন শোনা মাত্রই তিনি বুঝে ফেললেন- এ তো আল্লাহর হুকুম। যেহেতু নবীর স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই কোন প্রকার দ্বিধা না করে তৎক্ষনাত তিনি আল্লাহর হুকুম বুঝতে পেরে আল্লাহর নামে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার আবেগ ও আগ্রহ প্রকাশ করে বললেনঃ "হে আব্বাজান, আল্লাহ পাক আপনাকে যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তা আপনি যথাযথ পূর্ণ করুন। এ ব্যাপারে আপনি কোন প্রকার দ্বিধা করবেন না। আর আমার জন্যও কোন রকম চিন্তা করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি- সেই কঠিন মুহূর্তেও আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ ধৈর্যশীল পাবেন।"

সুযোগ্য পুত্রের মুখে এমন বুদ্ধিদীপ্ত আত্মোৎসর্গের স্পৃহা ও অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। ইবরাহীম আ.আশ্বস্থ হলেন এবং খুশীতে তাঁর মন ভরে উঠলো।

এখানে কতগুলো লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রথমত হযরত ইবরাহীম আ. কে ফেরেশতার মাধ্যমে সরাসরি হুকুম না করে স্বপ্নে দেখিয়ে ছিলেন। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইবরাহীম আ.-এর প্রভু আনুগত্য যেন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। নতুবা স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে আসল উদ্দেশ্য পাশ কাটিয়ে ইচ্ছা মাফিক অন্য কোন ব্যাখ্যা বের করে নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ.- এ ধরনের কোন পন্থা অবলম্বন না করে স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ যা, তার উপর আমল করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাছাড়া এ আদেশের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সত্য সত্যই ইসমাঈলকে যবেহ করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এতটুকুই ছিল যে, করেন। যাতে প্রভুপ্রেমে ত্যাগ স্বীকারে তিনি কতটুকু আন্তরিক একনিষ্ঠ তার পরীক্ষা হয়ে যায়।

সে মুতাবেক হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। এ পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও বাস্তবায়িত হলো। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক যদি সরাসরি হুকুম করতেন, তাহলে পরে আবার ইবরাহীম আ.-এর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর এ হুকুমটি রহিত করতে হতো এবং তখন আল্লাহ তা'আলার একটি হুকুম অকার্যকর গণ্য হত।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল আ. পিতার মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের কথা শুনেই আল্লাহর রাহে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করার সাথে সাথে পিতাকেও যেভাবে সান্তনা দিয়ে আশ্বস্থ করে এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সহায়তা করেছেন, তাঁকে যবেহ করার চরম মুহূর্তে ধৈর্যের যে চরম পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন এবং পিতাকে যে সকল গুরত্বপূর্ণ ও সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আলোচনার শেষাংশে তা উদ্ধৃত হবে।

মূল ঘটনাঃ

খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ. মহান আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে কুরবানীর নির্ধারিত স্থান মিনা'র পানে রওয়ানা হলেন।

আল্লাহর ইশক ও আনুগত্যের এমন মহান দৃষ্টান্ত দেখে ইবলিস শয়তানের আর সহ্য হচ্ছিল না। সে জানতো, আল্লাহর আনুগত্যে দৃড়পদ ইবরাহীম আ.-কে মুকাবিলা করে এতটুকুও টলানো যাবে না। তাই সে প্রথমে অতিশয় দয়ালু ও সহানুভূতিশীল মানুষের আকৃতিতে হযরত ইসমাঈলের আ. মাতা হযরত হাজেরা রা.-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ ইসমাঈল কোথায় গিয়েছে? হাজেরা উত্তর দিলেন- সে তো তাঁর আব্বার সঙ্গে জঙ্গল হতে কাষ্ঠখড়ি আনতে গিয়েছে। শয়তান বললো-তুমি জানোনা, তাঁর পিতা তাকে যবেহ করতে নিয়ে গেছে। হযরত হাজেরা রা. পাল্টা প্রশ্ন করলেন: এমন কোন পিতাও কি কোথাও আছে, যে আপন সন্তানকে যবেহ করে? শয়তান বললো- তিনি বলেন যে, আল্লাহ নাকি তাঁকে এ আদেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে যোগ্যমাতা যোগ্য উত্তরই দিলেন যে, বাস্তবিকই যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে, তাহলে তাকে একাজ করতে দেয়াই কর্তব্য।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এখান থেকে শয়তান হতাশ হয়ে পিতা-পুত্রের পিছু অবলম্বন করলো। তারা মক্কা হতে মিনা'র পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রথমে সে ইসমাঈলকে আ. বললো- তুমি কি জানো, তোমাকে তোমার আব্বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ইসমাঈল আ.বললেন, আমরা এ উপত্যকা হতে আমাদের বাড়ীর জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করবো। শয়তান বললো, তুমি জানো না, আমি হলফ করে বলছি তাঁর উদ্দেশ্য তোমাকে গলা কেটে যবেহ করা। ইসমাঈল আ. জিজ্ঞাসা করলেন: আব্বা আমাকে যবেহ করবেন কেন? শয়তান বললো, তোমার আব্বা বলেন যে, তাঁর প্রভু নাকি এরূপ নির্দেশ করেছেন। এ কথা শুনে হযরত ইসমাঈল আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ পাক তাঁকে যে হুকুম করেছেন, তিনি তা পালন করবেন। এরজন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি। এখানেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সে বন্ধু বেশে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলোঃ কোথায় যাচ্ছেন চাচাজান! হযরত ইবরাহীম আ. উত্তরে বললেন, আমি বিশেষ এক কাজে এ উপত্যকায় যাচ্ছি। শয়তান-বললো-আমার বিশ্বাস শয়তানই আপনাকে আল্লাহর নাম করে স্বপ্নের মধ্যে পুত্রকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে। এমন কথা শুনে হযরত ইবরাহীম আ. শয়তানকে চিনে ফেললেন এবং তার কুমতলব টের পেয়ে গেলেন। তিনি ধমক দিয়ে শয়তানকে বললেন- 'হে আল্লাহর দুশমন! তুই আমার এখান থেকে সরে যা। আমি যে কোন মূল্যে আমার প্রতিপালকের আদেশ পালনের লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবো।' এখানেও শয়তান ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। এরপরে যখন হযরত ইবরাহীম আ.জামরায়ে আকাবা (হজ্জের মধ্যে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করার প্রান্ত স্তম্ভ) এর নিকট পৌছলেন,তখন শয়তান সেখানে এক বিশালকায় আকৃতিতে ইবরাহীম আ.-এর গতিরোধ করে সামনে দাঁড়াল। হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে পূর্ব থেকেই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত ছিলেন। ফেরেশতা বললেন, শয়তানকে পাথর মারুন। ইবরাহীম আ. 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলে শয়তান পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এখান থেকে সামনে অগ্রসর হলে, শয়তান পুনরায় জামরায়ে উসতা (মধ্যস্তম্ভ)-এর নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলো। তখন এখানেও হযরত ইবরাহীম আ. তাকবীর ধ্বনি দিয়ে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর জামরায়ে উলা (১ম স্তম্ভ)-এর নিকট পৌঁছলে, তৃতীয়বারের মত শয়তান হযরত ইবরাহীম আ.-এর পথরোধ করে দাঁড়াল। এখানেও তিনি কঙ্কর মেরে শয়তানকে হটিয়ে দিলেন। স্মর্তব্য যে, হজ্জে শেষ পর্যায়ে রমীর (কংকর নিক্ষেপের) যে বিধান রয়েছে, তা হযরত ইবরাহীম আ.এর এই প্রিয় আমলের স্মৃতিকে কিয়ামত পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মোট কথা, অবশেষে হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ. কে সঙ্গে নিয়ে মিনা প্রান্তরে এক বিশাল প্রস্তর-খণ্ডের নিকট পৌঁছলেন। ইবরাহীম আ. যখন হযরত ইসমাঈলকে আ. যবেহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি পিতাকে লক্ষ করে হৃদয়স্পর্শী কণ্ঠে বললেন "আব্বাজান! যবেহ করার পূর্বে আমাকে ভালভাবে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি দাপাদাপি না করতে পারি। আর আপনার পরিধেয় কাপড় সমূহ গুছিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবেন, যাতে সেগুলোতে আমার রক্তের ছিটা লেগে আপনার কষ্টের দরুন আমার সাওয়াব কমে না যায়। আমার রক্তে রঞ্জিত কাপড় দেখলে আম্মাজানও বরদাস্ত করতে পারবেন না। আর আপনি যবেহ করার ছুরিটা ভালভাবে ধারালো করে নিন। আপনি আমার গলায় ছুরি দ্রুত চালাবেন যাতে সহজে আমার জান বের হতে পারে। কারণ, মৃত্যুযন্ত্রণা অতি কষ্টদায়ক। আর আম্মার কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাবেন। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার কাপড়গুলো আম্মার কাছে নিয়ে যাবেন। এতে হয়ত আম্মাজান কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।" স্বীয় প্রাণপ্রিয় ছোট্ট শিশুপুত্রে কোমল মুখে এমন সকরুণ বাক্যাবলী শুনে একজন পিতা হিসেবে হযরত ইবরাহীমের আ.হৃদয়ের অবস্থা কি যে হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ. সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে প্রিয় পুত্রকে বললেন: বৎস! তোমার এ ভূমিকা আল্লাহর আদেশ পালনে আমার জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তার জন্য তোমাকে আমার মন থেকে দু'আ দিচ্ছি।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. পুত্রের কথা মুতাবেক সবকিছু করে ইসমাঈলকে আ. মাটির উপর চিত করে শুইয়ে দিয়ে গলার উপর ছুরি চালাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতে কিছুতেই গলা কাটছিল না। ইবরাহীম আ. পাথরে ঘষে ২/৩ বার ছুরি ধার করে যবেহ করার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করলেন। প্রতিবারই স্বজোরে ছুরি চালালেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি আল্লাহর কুদরতের কারণে ব্যর্থ হলেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতীভাবে পিতলের একটি পাত হযরত ইসমাঈলের গলার উপর রেখে দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল আ. বললেন, আমার মুহাব্বতেই হয়ত আপনি কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। সুতরাং আপনি আমাকে উপুড় করে শুইয়ে যবেহ করুন। হযরত ইবরাহীম আ. তা-ই করলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসলঃ "হে ইবরাহীম! আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন।" গায়েবী আওয়াজ শুনে তিনি আসমানের দিকে চোখ তুললেন। তখন হযরত জিবরাঈলকে আ. দেখলেন যে, তিনি জান্নাতের একটি সুন্দর ও শিংধারী দুম্বা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, আল্লাহ পাক আপনার পুত্রের মুক্তিপন স্বরূপ এই দুম্বাটি প্রেরন করেছেন। অতএব ইসমাঈলের আ. পরিবর্তে আপনি এটাকে যবেহ করুন। তখন হযরত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ., ফেরেশতা জিবরাঈল আ. ও সেই দুম্বা সকলেই 'আল্লাহ আকবার' বলে উঠলেন।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম দুম্বাটিকে ধরে 'মিনা'র 'মানহার'- এ নিয়ে গিয়ে যবেহ করে কুরবানী করে দেন। আর এ দুম্বা বা অন্যকোন চতুষ্পদ জানোয়ার যবেহ করাই কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রিয় বস্তু কুরবানী করার উত্তম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এজন্যই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺকে যখন কুরবানীর হাকীকত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি উত্তর দিলেন- কুরবানী হচ্ছে তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ. এর সুন্নাত। সাহাবীগণ রা. দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন সেই কুরবানীর দ্বারা আমরা কী সাওয়াব পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন- কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশম ও লোমকুপের বিনিময়ে এক এক নেকী করে পাবে।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর উল্লেখিত ঘটনাবলী হতে আমরা নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহ শিখতে পারি

আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দান

(ক) হযরত ইবরাহীমের আ. ন্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে নিজের পিতা-মাতা ও সকল আপনজনের আবদার বা দাবীকে উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দেয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরী। অথচ আজকের মুসলমানগণ বিবাহ-শাদী সহ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে আল্লাহর হুকুমের অমান্য করে আত্মীয় স্বজনের দাবীর মুখে বিধর্মীদের আচার অনুষ্ঠান কে সগর্বে ও নির্লজ্জভাবে পালন করছে।

হায়াত মউত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

(খ) আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে শুধু আত্মীয় স্বজন নয়, বরং গোটা দেশবাসী সহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীগণও যদি বিরুদ্ধে চলে যায়, তথাপিও কোন মুমিন মুসলমান আল্লাহর হুকুম থেকে এক তিল পরিমাণও হটতে পারে না। কারণ- তার হায়াত-মউত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর তার ইমাম নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-নিবেদনকারী হযরত খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আ.।

হিজরত করা

(গ) দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য বা দ্বীন শিক্ষার জন্য কিংবা দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজন হলে, দেশ-খেশ সব কিছুই ত্যাগ করে আল্লাহর মনোনীত স্থানে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হিজরত করতে হবে। যেমন- হযরত ইবরাহীম আ. সিরিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

বিবি-বাচ্চা হতে দূরে অবস্থান

(ঘ) আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য এবং দ্বীন পালনের খাতিরে প্রয়োজন হলে বিবি-বাচ্চাদের থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। অর্থাৎ বিবি-বাচ্চা, আল-আওলাদের মুহাব্বত ও আকর্ষণ যেন আল্লাহর ও রাসূলের মহব্বত থেকে নিম্ন স্তরে থাকে। যাতে করে তাদের মুহাব্বতের কারণে দ্বীনের কাজে কোন বাধা না আসতে পারে, বা দ্বীনের কাজের মধ্যে ক্ষতি না আসে। হযরত ইবরাহীম আ. বিবি হাজেরা ও ইসমাঈল আ.কে আরবের মরু প্রান্তরে রেখে আল্লাহর প্রেমের যে পরম পরাকাষ্ঠ দেখিয়েছিলেন, সেটাই মুমিনের জন্য পালনীয় নমুনা।

দ্বীনী কর্মকারীর জন্য আল্লাহ-ই জিম্মাদার

(ঙ) কোন পিতা বা গার্জিয়ান যখন আল্লাহর হুকুমের খাতিরে বা দ্বীনের জরুরতে বিবি বাচ্চার জন্য যথাসাধ্য ইন্তিজাম করে বের হয়ে পড়ে, তখন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তার বিবি-বাচ্চা ও আল-আওলাদের জিম্মাদার হয়ে যান। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল আ. স্বয়ং। মরু-ভূমিতে হযরত ইসমাঈল আ.-এর পায়ের আঘাতে স্বীয় কুদরতে আল্লাহর তা'আলা পানির ইন্তিজাম করে দিলেন। যার নাম বীরে যমযম- যা কিয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি লোকের তৃষ্ণা নিবারণকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর নিয়ামত। এমন বরকতময় পানি মা হাজেরা রা. এর কুরবানীর বদলায় আল্লাহ দান করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় মেয়েরা আল্লাহর জন্য যখন কুরবানী করেছেন আল্লাহ দুনিয়াতে এর বদলা এমন দিয়েছেন যা বিড়ল। আমাদের মা-বোনরা যদি দীনের জন্য কুরবানী করেন আল্লাহ এর বিনিময় দুনিয়া আখেরাতে অবশ্যই দিবেন এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা।

নিজ সুবিধা মত ব্যাখ্যা দেয়া হারাম

(চ) আল্লাহর হুকুমের মধ্যে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা দেয়া হারাম। তাতে আল্লাহর হুকুমের গোলামী করা হয় না, বরং নিজের খাহেশাতের গোলামী করা হয়। স্বপ্নের ব্যাপারে ইচ্ছা করলে, হযরত ইবরাহীম আ. বিভিন্ন ব্যাখ্যা বের করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে পথ অবলম্বন না করে স্বপ্নের সহজ সরল ব্যাখ্যা করে কলিজার টুকরা ছেলে-সন্তানকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সাধারণদের জন্য উচিৎ প্রতিটা বিষয় আলেম-উলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী করা।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

সকল ভালোকাজে পিতাকে সাহায্য করা

(ছ) দ্বীনের কাজের মধ্যে পুত্র সর্বক্ষেত্রে পিতার সহযোগী হবে। সকল ভাল কাজে ও দ্বীনের খেমতে পুত্র পিতার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর ভূমিকা পালন করবে। যেমন- হযরত ইসমাঈল আ. নিজের কুরবানীর ব্যাপারে স্বীয় পিতাকে যথার্থভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কামিয়াবীর ঘোষণা

(জ) অনেক সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক কঠিন নির্দেশ আসে, যার বাস্তবায়ন আল্লাহর উদ্দেশ্য থাকে না। তিনি শুধু এতটুকু দেখতে চান যে, বান্দা তার সকল প্রকার হুকুম শিরোধার্য করে নেয়র জন্য প্রস্তুত আছে কি না? বান্দা যখন তার প্রস্তুতি শেষ করত: আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য নিজেকে পেশ করে, তখন আল্লাহর তা'আলা তাকে আর ঐ কঠিনতম কাজ করতে দেন না, বরং যতটুকু করেছে, তার উপর বান্দার কামিয়াবীর ঘোষণা করে নিজের খুশী প্রকাশ করে দেন। আর এ জন্য শেষ পর্যন্ত হযরত ইসমাঈল আ.কে কুরবানী না হতে দিয়ে তার বদলে দুম্বা কুরবানী করিয়ে পিতা পুত্রের কামিয়াবীর ঘোষণা দিলেন।

উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান লাভ

(ঝ) পিতা যখন আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় পুত্রকে বা নিজের প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি এবং তার প্রিয় বস্তুকে কবুল করে নেন এবং তাদেরকে উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. এর সেই মহাত্যাগ তথা কুরবানীর কারণে আল্লাহর তা'আলা ইবরাহীমকে আ. নিজের খলীল (একান্ত বন্ধু) উপাধিতে ভূষিতে করেছেন এবং পিতা পুত্র উভয়কে বিশ্ববাসীর জন্য ইমাম বা অনুসরনীয় বানিয়ে দিয়েছেন।

আজ যদি প্রত্যেক পিতাকে এ নির্দেশ দেয়া হতো যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করতে হবে, হবে আল্লাহপাক-ই ভাল জানেন যে, এ পরীক্ষায় কতজন কামিয়াব হতো। আল্লাহর তা'আলার অসীম মেহেরবানী যে, তিনি বান্দার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করে এ কঠিনতম নির্দেশ দেননি। বরং এর চেয়ে বহু গুণ সহজে এক নির্দেশ তিনি পিতাকে দিয়েছে যে, "আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি নিজের পুত্রকে আমার কালাম কুরআনে পাক ও দ্বীন শিক্ষা দাও। এটা তোমার পক্ষ থেকে তোমার ছেলের কুরবানী হয়ে যাবে। আর এর বদৌলতে আমি পিতা-পুত্র উভয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান ও পুরষ্কার দান করবো।"

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আফসোসের বিষয়! কতজন মুমিন মুসলমান যারা প্রতি বছর কুরবানী করছেন, বা কুরবানীর ওয়াজ শুনছেন তারা আল্লাহর এ গুরু নির্দেশ পালন করতে পেরেছেন কি? নির্দেশ পালন তো দূরের কথা, উপরন্তু কুরআনের তালীমকে তারা ফকীরের বিদ্যা উপাধি দিয়ে ইংরেজী বিদ্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহর দরবারে ইংরেজী বিদ্যার কোন ফযীলত নেই। আর মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে চরম অধঃপতন ও দুঃসাহস আর কি হতে পারে যে, সাধারণত যে পরিবেশে ও শিক্ষায় বদদ্বীন আর নাস্তিক পয়দা হয় ও হচ্ছে, সেই পরিবেশে পাঠানোর জন্যে কত রকম প্রচেষ্টা, পয়সা খরচ ও তদবীর। পক্ষান্তরে আল্লাহর কালাম রাসূলের হাদীস শিক্ষা দেয়ার জন্য সামান্য ত্যাগ বা চেষ্টাও নেই। উপরন্তু সেই ব্যাপারে কথা বললে, তার কত রকম উল্টা পাল্টা জবাব ও প্রতিবাদ আসে। এমনকি কেউ আল্লাহর মুহাব্বতে আসক্ত হয়ে স্বীয় পুত্রকে দ্বীন শিখতে দিলে অনেকেই তৈরী হয়ে যায় সমালোচনার ঝড় তোলার জন্যে। এতটুকুও বলেঃ তোমার এত ব্রেনী ছেলেটার দেমাগ কুরআন পড়িয়ে একেবারেই নষ্ট করে দিলে? (নাউজুবিল্লাহ) এ ধরনের কথা যারা বলে, তাদের ঈমানহারা হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

নেক কাজ ও মন্দ কাজের নগদ লাভ-ক্ষতি

(ঞ) যারা নেক কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান এবং সুনাম-সুখ্যাতি দান করেন, আর আখেরাতে তো মহা কল্যাণ আছেই। কুরআনের বিদ্যা অর্জনকারী নবী ﷺ -এর ওয়ারিশ। তার জন্য পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক দু'আ করে থাকে। তার থেকে মর্যাদাশীল আর কেউ হতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম মান্য করে না, আল্লাহর তা'আলা দুনিয়াতে তাদেরকে বে-ইয্যত করেন,তাদের লক্বব বা উপাধি হয় ফাসেক-ফাজের। আর তাদের দুনিয়ার যিন্দেগী হয় তিক্ততাময়। অথচ দুনিয়াতে তারা যদি কারূনের ধন বা ফিরআউনের রাজত্বের অধিকারীও হয়ে যায়, পরকালে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

হাজ্জ এর আহকামসমূহ

উমরা পালন করার নিয়ম

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইহরাম বাঁধা (ফরয):

উমরা পালনকারী মীকাতে পৌঁছে অথবা তার পূর্ব হতে গোসল বা উযূ করে (পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরে) ২ রাকা'আত নামায পড়ে মাথা হতে টুপি ইত্যাদি সরিয়ে কেবলামুখী হয়ে উমরার নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্ততঃ ৩ বার (পুরুষগণ সশব্দে) ৪ শ্বাসে তালবিয়াহ পাঠ করবে। তালবিয়া এই

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ—

لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ—

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ—

لَاشَرِيكَ لَكَ

নিয়ত ও তালবিয়ার দ্বারা ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন বেশী বেশী এ তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকবে।

তাওয়াফ করা (ফরয):

অতঃপর মসজিদুল হারামে প্রবেশের সুন্নাতের প্রতি লক্ষ রেখে তাওয়াফের স্থানে প্রবেশ করবে। এরপর তাওয়াফের স্থানে পৌঁছেই তালবিয়াহ বন্ধ করে দিবে। হাজরে আসওয়াদের দাগের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে উমরার তাওয়াফের নিয়ত করবে। তারপর দাগের উপর এসে হাজরে আসওয়াদকে সামনে করে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত তুলবে এবং তাকবীর বলবে। অতঃপর হাত ছেড়ে দিবে। এরপর ইশারার মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। অতঃপর পূর্ণ তাওয়াফে ইযতিবা ও প্রথম ৩ চক্করে রমল সহকারে উমরার ৭ চক্কর সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করবে। তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে মুলতাযামে হাযিরী দিয়ে দু'আ করবে, তারপর মাতাফের কিনারায় গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে বা যেখানে সহজ হয় ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু'রাকা'আত নামায আদায় করবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে।

সায়ী করা (ওয়াজিব):

এরপর সাফা মারওয়া এর সায়ী করার উদ্দেশ্যে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে বাবুস সাফা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে কিছুটা উপরে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

চড়বে এবং বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে। মারওয়াতে পৌঁছলে একবার সোত হয়ে গেল। এভাবে সাত সোত অর্থাৎ, ৭ বারে সায়ী সম্পন্ন করবে। মারওয়াতে কিছুটা উপরে চড়ে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করে সাফার দিকে চলবে। প্রত্যেক বার সাফা মারওয়াতে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু'আ করবে এবং প্রতিবার (পুরুষগণ) সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে দ্রুত চলবে। সায়ীর পর ২ রাকা'আত নফল নামায পড়বে। এবার সায়ী সম্পূর্ণ হল।

হালাল হওয়া (ওয়াজিব):

এরপর মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল ছোট করে হালাল হতে হবে। এখন আপনার উমরার কাজ সম্পূর্ণ হল।

হজ্জে ইফরাদ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইহরাম বাঁধা (ফরয):

হজ্জে ইফরাদ পালনকারী হজ্জের মাস সমূহে মীকাতে পৌঁছে বা তার পূর্ব হতে (বাংলাদেশী হাজীদের জন্য বাড়ী বা ঢাকা থেকে) হাজামাত (ক্ষৌরকার্য) ইত্যাদি সমাপ্ত করে গোসল করে বা কমপক্ষে উযূ করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে টুপি পরে দু'রাকা'আত ইহরামের নামায আদায় করবে। নামায শেষে টুপি খুলে হজ্জের নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্তত তিন বার আওয়াজ করে তালবিয়াহ পাঠ করবে। হজ্জের ইহরাম বাঁধা হল। এখন বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। তালবিয়াহ এই

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ—

لَبَّيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ—

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ—

لَاشَرِيكَ لَكَ

তাওয়াফ করাঃ

অতঃপর মক্কা মুকররমায় পৌঁছে মসজিদে প্রবেশের সুন্নত অনুযায়ী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফের স্থানে গিয়ে প্রথমে তাওয়াফে কুদূম সম্পূর্ণ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

করবে। তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত নিয়ম উমরার বয়ান থেকে দেখে নিন। ৭ চক্করে তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাতাফের নিকটি গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে করে বা অন্য স্থানে ২ রাকা□আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায এমনভাবে পড়বে, যেন তাওয়াফকারীদের সমস্যা না হয়। তারপর যমযমের পানি পান করবে, হজ্জের সায়ী এ তাওয়াফের পরই করার ইচ্ছা করলে উক্ত তাওয়াফে ইযতিবা ও ১ম তিন চক্করে রমল করতে হবে। উল্লেখ্য, ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদূমের পর মক্কায় অবস্থান কালে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে সাধ্যমত বিরত থেকে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করার চেষ্টা করবে। উল্লেখ্য সব ধরনের তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায পড়া ওয়াজিব। তাওয়াফকালে তালবিয়াহ উচ্চস্বরে পাঠ করবে না এবং হাজরে আসওয়াদ সামনে করা ছাড়া বাইতুল্লাহ এর দিকে সীনা ও দৃষ্টি করা যাবে না।

৮ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ

৮ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। ঐ দিন মিনায় গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং রাত্রি যাপন করে পর দিন ফজরের নামায সেখানে আদায় করা সুন্নাত। মুআল্লিমগণ সাধারণতঃ ৭ই জিলহজ্জ রাত্রেই হাজীদেরকে মিনার তাবুতে পৌঁছে দেয়। নতুন লোকদের জন্য পেরেশানী থেকে বাঁচার জন্য অগ্রিম যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ৮ তারিখ যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছতে হবে। সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত জরুরী সামান-বিছানা এবং পরিধেয় কাপড় নিতে হবে এবং কয়েক দিনের খাবারের জন্য মুয়াল্লিমের নিকট টাকা জমা দেয়াটাই সহজ উপায়। আর মিনাতেও খানা-পিনা কিনে খাবার ব্যবস্থা আছে।

৯ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ

উকূফে আরাফা (ফরয):

ঐদিন ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করে (পুরুষগণ আওয়াজ করে, এবং মহিলাগণ নীরবে ১ বার) তাকবীরে তাশরীক পড়ে নিবে। নাস্তা ইত্যাদির জরুরত শেষে সূর্য উঠার পর তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হতে হবে। আরাফায় পৌঁছে মুয়াল্লিমের তাবুতে উকূফ করতে হবে, তাবুতে না থাকলে আরাফায় নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে।

সংক্ষেপে উকূফের পদ্ধতিঃ

এই ময়দানে পৌঁছে সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ে দাঁড়িয়ে, আর কষ্ট হলে বসে দু'আ-কালাম-তাসবীহ-তাহলীল পড়তে থাকবে। তারপর

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হানাফী মাযহাব মতে আসরের সময় হলে আসর নামায পড়ে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে দু'আ ও যিকিরে মশগুল থাকবে। অন্য আযান শুনে কোন অবস্থায় আসরের ওয়াক্তের পূর্বে আসর পড়বে না। আরাফার ময়দানে এই অবস্থানকে 'উকূফে আরাফা' বলা হয়। সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরে এখানে বা রাস্তায় মাগরিব না পড়ে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মুআল্লিমের গাড়ীতে করে মুযদালিফায় রওয়ানা হবে যাবে।

মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা (ওয়াজিব):

মুযদালিফা ময়দানে পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর এক আযান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিব ও পরে ইশার ফরয নামায আদায় করতে হবে। তারপর সুন্নাত, নফল ও বিতির পড়বে। অতঃপর মুযদালিফার খোলা ময়দানে রাতে অবস্থান করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে তাসবিহ-তাহলীল যিকির ও দু'আয় মশগুল থাকবে। এ সময় অবস্থান করাকে "উকূফে মুযদালিফা" বলে। এখান থেকে ৪৯ টি পাথরকণা সঙ্গে নিবে। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পূর্বেই তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে রওয়ানা হয়ে যাবে।

১০ই যিলহজ্বে করণীয়ঃ

রমী করা জামরায়ে উকবা তথা বড় শয়তানকে কংকর মারা (ওয়াজিব): মিনায় পৌঁছে জরুরত সেরে এই দিন শুধুমাত্র জামরায়ে উকবায় তথা বড় শয়তানের স্থানে রমী করার জন্য ভীড় কমার অপেক্ষা করবে। কারণ এখানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আজকাল সাধারণত আসরের নামাযের পূর্বে ভীড় কমে না। এ জন্য আউয়াল ওয়াক্তে আসর পড়ে বা প্রয়োজনে আরো পরে বড় শয়তানের বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। এটাকেই রমী করা বলা হয়। উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্বে বড় শয়তানের নিকট পৌঁছে প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বক্ষণেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে।

কুরবানী করা (মুস্তাহাব):

রমী শেষে সময় থাকলে এদিন অন্যথায় পরের দিন পশু বাজারে গিয়ে বা আমানতদার কাউকে পাঠিয়ে কুরবানী করবে। হজ্বে ইফরাদ পালনকারীর জন্য কুরবাণী করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। সুতরাং তাওফীক থাকলে কুরবানী করতে চেষ্টা করবে।

হালাল হওয়া (ওয়াজিব):

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বড় শয়তানকে কংকর মারার পরে এবং কুরবানী করলে কুরবানী শেষে মাথা মুন্ডাতে বা চুল ছাটতে হবে এবং এর মাধ্যমেই মুহরিম হজ্বের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেল। হালাল হওয়ার সময় চেহারার নূর দাঁড়ি কোনক্রমেই মুণ্ডাবেন না। যাদের এখনো দাঁড়ি রাখার সৌভাগ্য হয়নি তারা পূর্বেই এব্যাপারে পাক্কা নিয়ত করে নিবেন। যাতে করে দাঁড়ি নিয়ে রওজা শরীফ যিয়ারত করতে পারেন।

তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয) ও সায়ী করা (ওয়াজিব):

হালাল হওয়া তথা ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা ও সাফা-মারওয়াতে সায়ী করা। ১০ থেকে ১২ যিলহজ্বে সূর্য ডোবার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ করতে হবে। তাওয়াফে কুদূমের পরে হজ্বের সায়ী না করে থাকলে এই তাওয়াফের পরে সাফা-মারওয়াতে সায়ী করতে হবে। সায়ী করার তরীকা উমরা এর বর্ণনায় দেখে নিন। সায়ীর পরে দু'রাকা'আত নামায পড়বে। এরপর মিনা ফিরে আসবে।

১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্বের করণীয়:

তিন জামরায় কংকর মারা ওয়াজিবঃ

১১ ও ১২ যিলহজ্বে ভীড় থেকে বাঁচার জন্য বাদ আসর প্রথমে ছোট, পরে মাঝারী সবশেষে বড় জামরার বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি করে কংকর মারবে। এ কয়দিন মিনায় রাত যাপন করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, ১২ই যিলহজ্বে ৩ জামরায় কংকর মেরে কেউ মক্কা চলে গেলে কোন অসুবিধা নাই। তবে বিশেষ কোন জরুরত না থাকলে ১৩ই যিলহজ্বে বিকাল ৩টার দিকে পর্যায়ক্রমে তিন জামরায় কংকর মেরে মক্কায় যাওয়া উত্তম। নবী কারীম ﷺ ১৩ যিলহজ্বে কংকর মেরে মক্কা গিয়েছিলেন। ১৩ যিলহজ্বে আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়তে হবে।

তাওয়াফে বিদা (ওয়াজিব):

যখন মক্কা শরীফ থেকে চলে আসার সময় হয় তখন শান্তভাবে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ শরীফে এসে ৭ চক্কর তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তারপর ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু'রাকা'আত নামায পড়ে যমযমের পানি পান করে আবারও বাইতুল্লাহ যিয়ারতের তাওফীক লাভের জন্য মনে প্রাণে দু'আ করা অবস্থায় চলে আসবে। ইহাকে তাওয়াফে বিদা বলা হয়। এ তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল নেই এবং পরে কোন সায়ী নেই উল্লেখ্য

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

প্রতিবার মসজিদে হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখবে।

হজ্জে তামাত্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

যারা তামাত্তু হজ্জ করতে চায় তারা প্রথমে উমরার বর্ণিত নিয়মে উমরা পালন করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যাবে। (এরপর যে কয়দিন মক্কা শরীফে থাকবে, বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবে। বেশী বেশী নফল উমরা করা থেকে নফল তাওয়াফ করাই উত্তম।) তারপর মিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জে ইফরাদের বর্ণিত নিয়মে হজ্জ সম্পূর্ণ করবেন।

হজ্জে কিরানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

আর যারা হজ্জে কিরান করতে চান তারা মীকাত থেকে বা তার পূর্ব হতে একত্রে উমরা ও হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তারা উমরাহ শেষে ইহরাম অবস্থায় থাকবেন। তারা উমরাহ করে হালাল হতে পারবেন না। হজ্জে সকল কাজ সম্পন্ন করে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মাথা মুণ্ডিয়ে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার সময় হজ্জ ও উমরার উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, কিরান ও তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব এবং তাদের জন্য মাথা মুণ্ডানোর পূর্বেই কুরবানী করা ওয়াজিব। আর ব্যাংকের ওয়াদাকৃত সময় সাধারণত ঠিক থাকে না সে জন্য হালাল হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ জন্য তামাত্তু ও কিরানকারীরা কোনো অবস্থায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করবে না।

মহিলাদের হজ্জের পার্থক্যঃ

মহিলাগণ স্বাভাবিক পোষাকেই ইহরাম বাধবে এবং মাথা ঢেকে নিবে চেহারা খোলা রাখবে না বরং চেহারার পর্দা করবে এবং এমনভাবে নেকাব লাগাবে যেন চেহারার সাথে কাপড় লেগে না থাকে। তালবিয়াহ নিম্ন আওয়াজে পড়বে। তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল করবে না। সায়ীতে সবুজ বাতিদ্বয়ের মাঝে স্বাভাবিক চলবে। চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে হালাল হবে। পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে মাতাফের কিনারা দিয়ে বা ছাদে গিয়ে তাওয়াফ করবে। হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করবে না, চলে আসার সময় হায়েযা হলে তাওয়াফে বিদা মাফ হয়ে যাবে। নামায সমূহ মক্কা বা মদীনার অবস্থানগৃহে আদায় করবে, এতে সাওয়াব বেশী হবে। মক্কা শরীফে শুধু তাওয়াফের জন্য এবং মদীনা শরীফে নির্দিষ্ট সময়ে শুধু রওজা যিয়ারতের জন্য মসজিদে যাবে।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হজ্বের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহঃ

হজ্ব ইসলামের একটি স্তম্ভ। বিত্তবানদের উপরে জীবনে একবার ফরয; দেরি না করা ওয়াজিব। আর স্বাস্থ্য ও অর্থ থাকলে প্রতি চার বছরে এক বার বাইতুল্লাহ শরীফে নফল হজ্ব বা উমরার মাধ্যমে হাযির হওয়া বাইতুল্লাহ শরীফের হক।

১.'হজ্বে বদল'-এ যারা যায়, পাঠানেওয়ালা যদি তামাত্তু বা যে কোনো হজ্বের অনুমতি দেয় বা সে অনুমতি নিয়ে নেয় তাহলে ফাতওয়া হলোদ যদিও ইফরাদ করা উত্তম, তবে তামাত্তু করা জায়িয। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ., মুফতী শফী রহ. ও মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বর্তমান যুগের কোনো আলিমের এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। সূত্র: জাওয়াহিরুল ফিকহ (পৃ. ৫০৮-৫১৬) ইমদাদুল আহকাম (২য় খণ্ড, পৃ.১৮৬)

২.সাধারণত মাসআলার কিতাবগুলোতে লেখা আছে যে, মক্কা ভিন্ন শহর আর মিনা ভিন্ন শহর। অতএব দুই শহর মিলিয়ে যদি কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুকীম বা মুসাফির হওয়ার মাসআলা পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। পরিস্থিতি পাল্টে গেলে মাসআলা পাল্টে যাবে। আর বর্তমান পরিস্থিতি হলো মক্কা ও মিনা এখন দুই শহর নেই, আবাদী মিলে এখন এক হয়ে গেছে। এমনকি মুযদালিফা-আরাফা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মিনার সমস্ত ইন্তেজামী কাজ মক্কার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আবাদী মিলে যাওয়া ও সরকার কর্তৃক ইন্তেজামী বিষয় এক করে নেওয়ায় মিনা মক্কা শহরের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে, বা কমপক্ষে মিনাকে মক্কা শহরের উপকণ্ঠ/শহরতলী বলা হবে।

অতএব কিতাবের উল্লিখিত মাসআলা পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার কারণে কার্যকর থকবে না। সুতরাং এখন যদি মক্কা-মিনা মিলিয়ে কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম গণ্য হবে। মাসআলাটি ভালো করে বুঝে রাখা দরকার। কারণ অনেক আলিমও পরিস্থিতি না জানার কারণে পুরনো কিতাবের মাসআলা বলে থাকেন।

এটার একটা নমুনা আমদের ঢাকাতেই আছে। যেমন, একটা সময় ছিল সফরের উদ্দেশ্যে কেউ ঢাকা ত্যাগ করে বিমানবন্দরে গেলে তাকে মুসাফির বলা হতো। কারণ, তখন ঢাকা আর বিমানবন্দরের মাঝে বেশ ফাঁকা ছিল; কোনো আবাদী ছিল না। আর সরকারও তখন এয়ারপোর্ট-উত্তরা এলাকাকে শহরের মধ্যে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

শামিল করে নাই। তখন উলামাদের ফাতওয়া ছিল এয়ারপোর্ট গেলে সে মুসাফির গণ্য হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ফাঁকাটা বসতিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এবং সরকার টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত শহরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় এখন ফাতওয়া হচ্ছে কেউ বিদেশ ভ্রমনের জন্য এয়ারপোর্ট গেলে তিনি মুসাফির হবেন না; বরং মুকীম থাকবেন যতক্ষণ না বিমান উপরে উঠে। এখানে যে মাসআলা, মক্কা-মিনায়ও সেই মাসআলা।

কাজেই যেহেতু তারা মুকীম হলো তাই তাদের জন্য আরো কয়েকটা মাসআলা মানতে হবে।

(ক) তাদের এখন মক্কা-মিনা-মুযদালিফা-আরাফায় চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায চার রাকা'আতই পড়তে হবে। (মুসলিম ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৬৮৭)

(খ) মিনায় ১২ বা ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হয়। এর মধ্যে যদি কোনো দিন শুক্রবার হয় তাহলে মিনাতে জুমু'আ পড়তে হবে। কারণ, এটা শহর বা শহরতলী। (তাতারখানিয়া ২য় খণ্ড পৃ.৫৫৩, মাসআলা নং-৩২৭৬)

অথচ আমি এবার (২০১২ ইং) হজ্বে গেলাম। খবর নিলাম; কেউ যুহর পুরা পড়েছে, কেউ দুই রাকা'আত পড়েছে। অথচ তাদের অবস্থান মিনা-মক্কা মিলে পনেরো দিনের বেশি থাকা হচ্ছে এবং শহরতলীতে অবস্থান করছে। তারপরেও তারা জুমু'আ তো পড়েই নাই, আবার যুহরের মধ্যে কসর করেছে। সঠিক মাসআলা না জানার কারণে তারা এ সমস্ত ভুল করেছে এবং এখনো অনেকে করছে।

(গ) নিসাবের মালিক হওয়ার কারণে দেশে যে প্রত্যেক বছর একটা কুরবানী করতো, মুকীম হয়ে যাওয়ায় ঐ কুরবানিটা বহাল থাকবে। চাইলে দেশেও করতে পারে, চাইলে সেখানেও করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, হজ্বের কুরবানী ভিন্ন। যা তামাত্তু বা কিরান করার কারণে হারামের সীমানায় ১২ই যিলহজ্বের মধ্যে করতে হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড পৃ.৫১৫)

মহিলাদের কিছু ভুলঃ

(ক) চেহারা খোলা রাখা। মাসআলা হলো চেহারা দেখা যাবে না; তবে বোরকার নেকাব চেহারার সাথে লেগে থাকবে না। এর জন্য এমন কিছু ব্যবহার করতে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হবে যাতে করে নেকাব চেহারার সাথে না লেগে না থাকে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২য় খণ্ড পৃ.৫২৭)

(খ) মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত হারামের জামা'আতে ও জুমু'আয় যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী। অথচ দেখা যায় যে, মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে যাচ্ছে! যার কারণে ভিড় বেশি হচ্ছে। তারাও গুনাহগার হচ্ছে, পুরুষরাও গুনাহগার হচ্ছে। আর হাজারো পুরুষের ধাক্কা খাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। আর পুরুষের পাশে দাঁড়ানোর কারণে পুরুষের নামাযও নষ্ট হচ্ছে। তারা যাচ্ছে ফযিলতের জন্য; অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা হজ্ব বা উমরার জন্য মক্কায় এসে ঘরে নামায পড়লে এক লাখের চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে (মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পৃ.২৯৭, ৩০১। হাদীস নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । তেমনিভাবে মদীনার মসজিদে নববী থেকে তার ঘরের নামাযের ফযিলত বেশী । অতএব মহিলারা জুমু'আয়ও যাবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও যাবে না। তবে তাওয়াফ করতে গিয়েছে এমন সময় কোনো নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল সে সময় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়ে নিতে পারবে। চাই তাওয়াফ হজ্বের হোক বা উমরার হোক, বা অন্য কোনো তাওয়াফ হোক।

কয়েকটি মারাত্মক ভুল:

(ক) এক শ্রেণীর হাজী সাহেব আছে, তারা সারাদিন মোবাইল বা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে থাকে। অথচ জানদারের ছবি তোলা হারাম কাজ (বুখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড পৃ.৭১, হাদীস নং ৫৯৫০) । তারা হজ্বে গিয়েও হারাম শরীফের মধ্যে এই হারাম কাজ করছে। হজ্বের সফরে হারাম কাজ করলে হজ্বে মাবরূর নসীব হয় না।

(খ) অনেক পুরুষ ইহরাম খোলার সময় যেখানে শরী'আত বলেছে মাথা মুণ্ডানোর কথা সেখানে তারা দাড়িও মুণ্ডায়। আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন,"দেশে অন্যায় কাজ করলে, আল্লাহর ঘরে গিয়েও তা করলে; এভাবে তোমার কয়েক লাখ টাকার হজ্ব ঐ জায়গায়ই দাফন করে রেখে আসলে"।

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন কেউ দাঁড়ি-কাটা অবস্থায় 'আস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দেন না। কারণ সে প্রতিদিন রাসূলের কলিজায় খুর চালায়। তাই এমন কেউ সালাম দিলে তিনি চেহারা মোবারক আরেক দিকে ফিরিয়ে নেন। এমন অবস্থায় একশত বার হজ্ব করলেও তার হজ্বে মাবরূর নসীব হবে না।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

(গ) 'তালবিয়া' ইনফিরাদী আমল। সবাই যার যার তালবিয়া পড়বে। দেখা যায়, অনেকে লিডারের সাথে তাল মিলিয়ে তালবিয়া পড়তে থাকে। অথচ এর কোনো প্রমাণ নাই।

(ঘ) আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যখানে ৫ কিলোমিটার প্রশস্থ একটি ময়দান আছে, যেখানে অনেক টয়লেট ও গাছপালা আছে এ সব থেকে অনেকেই এটাকে মুযদালিফা মনে করে এখানে অবস্থান করে, অথচ এটা আরাফার মধ্যে দাখিল নয় এবং মুযদালিফার মধ্যে ও দাখিল নয়, এটা ভিন্ন একটা ময়দান, এখানে হজ্বের কোন কাজ নাই। এখানে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া জায়িয নাই, এবং রাত্রে অবস্থান করাও জায়িয নাই। এবং বা'দ ফজর এখানে উকূফে করলে উকূফে মুযদালিফাও আদায় হবে না। অথচ যারা পায়দল আরাফা থেকে মুযদালিফায় যায় তাদের অনেকে এ ভুলটা করে। তাদের উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায় তাও তারা না জানার কারণে আদায় করে না।

(ঙ) ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী না করানো উচিত। কারণ এতে কখনো ১০ তারিখে বড় শয়তানকে কংকর মারার আগে কুরবানী হয়ে যায়। আবার কখনো কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডানো হয়ে যায়। আর এ উভয় ভুলের দরুন তামাত্তু ও কিরানকারীর উপর দম ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ তাদের জন্য ১০ তারিখে এই তিনটি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী।

(১) বড় শয়তানকে কংকর মারা, (২) কুরবানী করা ও (৩) মাথা মুণ্ডানো।

এজন্য নিজেরা বা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে কুরবানীর ব্যবস্থা করা জরুরী। কংকর মারার পর কুরবানী করবে, তারপর কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর মাথা মুণ্ডাবে। মাথা মুণ্ডানোর দ্বারা বা চুল ছোট করার দ্বারা হালাল হয়ে যাবে, তখন ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা এখন জায়িয হয়ে যাবে। উল্লেখ্য ইহরামের চাদর খুললে ইহরাম খোলা হয় না বা হালাল হওয়া যায় না।

যিলহজ্জ মাসে করণীয় ও বর্জনীয়

আরবী বছরের শেষ মাস যিলহজ্জ মাস। হাদীসে আসছে "ইন্নামা ইবরতু বিল খাওয়াতীন" । শরী'আতে শেষেরটাকেই ধরা হয়। শেষ অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন কেউ সারা জীবন মু'মিন ছিল কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান হারা হয়ে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মারা গেল তো তার স্থান হবে জাহান্নাম। আবার কেউ যদি সারা জীবন কাফের থাকে কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মারা যায় তো তার স্থান হবে জান্নাত। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। এই জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন প্রতিদিনের আমল এমনভাবে সাজিয়েছেন। আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন ইবাদত দিয়ে দিন শুরু করি। অর্থাৎ ফজর নামায পড়ি। আবার যখন ঘুমাতে যাই তখন ইশার নামায পড়ে ঘুমাতে যাই। শরী'আতের হুকুম অনুযায়ী ইশার নামায পড়ে দুনিয়াবী আর কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম করা হয়নি কিন্তু নিষেধ বা অপছন্দনীয়। যেন শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আর ফজরের জন্য উঠতে পারি এবং এই জন্য চার মাযহাবের ইমাম ইশার নামায একটু দেরী করে পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। সর্ব্বোচ্চ অল্প একটু সময় তালীম করা যেতে পারে। রাতের খানা এইজন্য ইশার নামাযের আগে খেতে বলা হয়েছে। যেন রাতের খানা খাওয়ার পর ইশার নামায পড়তে যাওয়ার সময় একটু হাঁটা চলা হয়। আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার ফায়দার কথাও চিন্তা করেছেন। আল্লাহ ফেরেস্তাদের জিজ্ঞেস করেন,"তোমরা আমার বান্দাদের কী হালে দেখছো?" ফেরেস্তারা বলেন, "হে আল্লাহ তাদের শুরু বন্দেগী এবং শেষও হয় বন্দেগীতে।" আল্লাহ বলেন, "তাহলে আর কী, যার শুরু এবং শেষ বন্দেগী তার পুরোটাই বন্দেগী লিখে দাও।" এই জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন শেষ মাসকে এমন ভাবে সাজিয়েছেন যেন মু'মিনের শেষটা ভালো হয়ে যায়।

যিলহজ্জ মাসে অনেক ইবাদাত। নিম্নে কুরআন হাদীসের আলোকে ইবাদতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফযীলত

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ.

'এমন কোনো দিন নেই যার আমল যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ﷻ পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর ﷻ পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর ﷻ পথে যুদ্ধে বের হল এবং এর কোনো কিছু নিয়েই ফেরত এলো না (তার কথা ভিন্ন)।' [বুখারী : ৯৬৯; আবূ দাউদ : ২৪৪০; তিরমিযী : ৭৫৭]

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتكبير والتَّحْمِيدِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ.

‘এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তাই তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি করে পড়।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৩২; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৩৪৭৪; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৪]
অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: إِلا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ».

‘যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশদিনের মতো আল্লাহর কাছে উত্তম কোনো দিন নেই। সাহাবীরা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ , আল্লাহর পথে জিহাদেও কি এর চেয়ে উত্তম দিন নেই? তিনি বললেন, হ্যা, কেবল সে-ই যে (জিহাদে) তার চেহারাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।’ [সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/১৫; মুসনাদ আবী আওয়ানা : ৩০২৩]

এ হাদীসগুলোর মর্ম হল, বছরে যতগুলো মর্যাদাপূর্ণ দিন আছে তার মধ্যে এ দশ দিনের প্রতিটি দিনই সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর এ উৎসাহ প্রদান এ সময়টার ফযীলত প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ওপরে ইবন উমর রাযি. আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।
ইবন রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, নেক আমলের মৌসুম হিসেবে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক হল সর্বোত্তম, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় أَحَبُّ (‘আহাব্বু’ তথা সর্বাধিক প্রিয়) শব্দ এসেছে আবার কোনো কোনো বর্ণনায় أَفْضَلُ (‘আফযালু’ তথা সর্বোত্তম) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোনো সময়ে নেক আমল করার থেকে বেশি মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ। এজন্য উম্মতের অগ্রবর্তী পুণ্যবান

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

মুসলিমগণ এ সময়গুলোতে অধিকহারে ইবাদতে মনোনিবেশ করতেন। যেমন আবূ ছিমান নাহদী বলেন,

كانوا.أي السلف.يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم.

'তাঁরা অর্থাৎ সালাফ তথা পূর্বসূরীগণ দিনটি দশককে অনেক বেশি মর্যাদাবান জ্ঞান করতেন : রমযানের শেষ দশক, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক এবং মুহাররমের প্রথম দশক।'

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের রাতের নেক আমল

যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় রাতের ইবাদত বন্দেগী লাইলাতুল কদরের রাতের ইবাদত বন্দেগীর সমতূল্য। এই ৯টি রাত কুরআন এবং হাদীসের আলোকে যিলহজ্জ মাসের দশ রাতের ফযীলত সুপ্রমাণিত। কুরআন শরীফে সুরায়ে ফাজরে আল্লাহ তা'আলা এই দশ রাতের শপথ করে বলেছেন, শপথ দশ রাতের, শপথ যা জোড় ও বেজোড়, শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে।" এই চারটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি বস্তুর শপথ করেছেন।

(১) ফজর ; (২) দশ রাতের ; (৩) জোড়ের ; (৪) বেজোড়ের ; (৫) রাতের।

অধিকাংশ মুফাসসিরীনদের মতে দশ রাত দ্বারা যিলহজ্জ মাসের এই দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফু হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। তাতে কুরবানির দিনও শামিল।

উল্লেখিত দশ রাত সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর দিন ও রাত্রির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার ইবাদতের জন্য সবচেয়ে প্রিয় হল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, এই গুলির তুলনায় ইবাদতের জন্য প্রিয় আর কোন দিন নেই। এই দিন গুলির এক একটি রোযা এক বৎসর রোযা রাখার সমতুল্য, আর ঐ রাতগুলির এক একটির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। (ফাযাইলুল আওকাত লিল বাইহাকী-৩৪৬, শুআবুল ঈমান, ৩/৩৫৫)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এই দশ দিনের নেক আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট যতটা পছন্দনীয় অন্যদিনের আমল ততটা নয়। (বুখারী শরীফ)

এসব হাদীস দ্বারা আমরা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ও রাতের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম। হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলিকে রাসূলে আকরাম ﷺ কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাআত সুন্নাত। (নাসাঈ শরীফ, মিশকাত-১৮০)
আলোচ্য হাদীসে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক বলতে এখানে নয় দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা অন্য এক হাদীসে দশ তারিখে ঈদের দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

আরাফা দিবসের ফযীলত

যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখকে ইয়াওমে আরাফা বা আরাফার দিন বলা হয়ে থাকে। এই দিন হজ্জের মূল অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটি যেমন ফযীলতপূর্ণ তদ্রুপ এর পূর্ববর্তী রাতটিও ফযীলতপূর্ণ। এই দিন সম্বন্ধে হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, হযরত আবু কাতাদাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশাবাদী যে, আরাফা দিবসের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে। আর আল্লাহর নিকট এও আশাবাদী যে, আশুরার রোযা তার পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত-১৭৯)

তাকবীরে তাশরীক

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সকল সাবালক পুরুষ,মহিলার জিম্মায় উক্ত তাকবীর একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা ওয়াজিব নয়। পুরুষগণ উচ্চস্বরে আর মহিলাগণ নিম্নস্বরে পড়বে। তাকবীরে তাশরীক এই :

.الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ) (আদ্দুররুল মুখতার:২/১৭৭-১৮০)

কুরবানীর করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, (তরজমা) "আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" (সূরা কাউছার-২)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।" (ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩১২৩)

কুরবানীর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, নবীজী ﷺ বলেনঃ কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, পশম, খুর, ইত্যাদিসহ কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় তা ওজন করা হবে। আর কুরবানীর পশু যবেহ করার সাথে সাথে তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ পাকের দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানী কর।" (তিরমিযী শরীফ হাঃ নং ১৪৯৭)

কুরবানীর হুকুম

যিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ সূর্যোদয় হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যদি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক,প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, অর্থাৎ ঋণমুক্ত থাকা অবস্থায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫০) তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের মাল কিংবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোন সম্পদ থাকে তাহলে তার উপর নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। বরং তারা নিসাবের মালিক হলে নিজেরাই নিজের কুরবানী আদায় করবে। অথবা তাদের অনুমতিক্রমে গৃহকর্তা তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিবে। (শামী-৬/৩১২, আল ফিকহুল ইসলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮)

কারো পক্ষ হতে তার অনুমতি ব্যতীত ওয়াজিব কুরবানী করা হলে সে ওয়াজিব আদায় হবে না। অবশ্য একই পরিবারভুক্ত কোন সদস্য অন্য সদস্যের পক্ষ হতে তার জ্ঞাতসারে নিয়মিত কুরবানী করে আসলে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব আদায়

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হয়ে যাবে, তবে এক্ষেত্রে উত্তম হল প্রকাশ্যে তার থেকেও অনুমতি নিয়ে নেয়া। (আদ্দুররুল মুখতার-৬/৩১৫)

কুরবানীর পশু

চান্দ্র মাস হিসাবে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ও পূর্ণ দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর বয়সের উট-এ ছয় প্রকারের জন্তু দ্বারা কুরবানী করা যায়। প্রথম তিনটি মাত্র এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং পরের তিনটি সর্বোচ্চ সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। তবে শর্ত হল,সকলের নিয়ত খাঁটি ভাবে সওয়াবের জন্য হতে হবে। সাত শরীকের কোন একজনের নিয়তও যদি শুধু গোশত খাওয়ার জন্য হয় তাহলে কারো কুরবানীই আদায় হবে না। (শামী-৬/৩১৫)

তেমনিভাবে কোন শরীকের মাল হারাম হলে বা অনুমতি না নিয়ে কাউকে শরীক করলে সেক্ষেত্রে সকলের কুরবানী বাতিল হয়ে যায়। (শামী-৬/৩২৬)

উল্লেখ্য যে, ভেড়া ও দুম্বা যদি এমন হৃষ্ট-পুষ্ট হয় যে, ছয় মাসের বয়সেরটিও দেখতে এক বৎসর বয়স্ক মনে হয় তবে এর দ্বারাও কুরবানী জায়িয আছে। কিন্তু বকরী বা ছাগলের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩২১)

অন্ধ, কানা ও ল্যাংড়া জন্তু বা এমন রুগ্ন ও দুর্বল জন্তু কুরবানীর স্থান পর্যন্ত যার হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই, অনুরূপভাবে এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী লেজ ও কান কাটা কিংবা লেজ ও কান বিহীন পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এবং অধিকাংশ দাঁত পড়ে যাওয়া পশু দ্বারাও কুরবানী সহীহ হবে না। (শামী:৬/৩২৩, আল বাহরুর রায়িক:৮/৩২৪)

যবাইয়ের মাসাইল

১. নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাই করা মুস্তাহাব, নিজে সক্ষম না হলে অন্য লোক দ্বারা করানো যায়।কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিজে উপস্থিত থাকা উত্তম। মহিলাগণও সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে থেকে অবলোকন করতে পারলে করবেন। (ফাতাওয়ায়ে শামী:৬/৩২৮, আল বাহরুর রায়িক:৮/২৩৮)

২. কুরবানী নিয়ত শুধু মালিক কর্তৃক মনে মনে করাই যথেষ্ট, মুখে কিছু বলার আবশ্যকতা নেই। অনুরূপভাবে মালিক নিয়ত করার পর যবাইকারী কর্তৃক নামের লিস্ট পড়ারও জরুরত নেই। তবে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" অবশ্যই বলতে হবে। (শামী:৬/২৯৭-৩০১, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/২৭৩১)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. কুরবানীর দু'আ সশব্দে পড়া জরুরী নয়, মনে মনে পড়াই যথেষ্ট। দু'আ না পড়লেও কুরবানীর কোন অসুবিধা হবে না। (শামী:৬/২৯৭)

৪. হলক এবং কণ্ঠের মধ্যখানে যবেহ করতে হবে। নতুবা জানোয়ারটি হালাল হবে না। (বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৪১)

৫. গলার ৪টি রগ তথা: খাদ্যনালী, শ্বাসনালী, দুটি রক্তনালী হতে কমপক্ষে ৩টি রগ না কাটলে পশু হালাল হবে না। (বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৪১)

৬. কুরবানীর পশুকে মাথা দক্ষিণ দিকে দিয়ে কিবলামুখী করে শুইয়ে প্রথমে এ দু'আটি পড়তে পারলে পড়বে:

اللهم إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين، لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

অত:পর "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর " বলে যবাই করবে। যবাই করার পর এ দু'আটি পড়া ভাল:

اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام

(বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৬০, জাওয়াহিরুল ফিকহ:১/৪৫০)

কুরবানীর গোশত

১. কুরবানী শরীকানা হলে গোশত ওজন করে সমানভাগে বণ্টন করা জরুরী। অনুমান করে বণ্টন করা নাজায়িয। (আল বাহরুর রায়িক:৮/৩২৭)

২. মুস্তাহাব বা উত্তম হচ্ছে, কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজেরা রাখবে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দিবে এবং এক ভাগ গরীব মিসকীনদের দান করবে। তবে এটা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই যদি কেউ কুরবানীর সমস্ত গোশত প্রয়োজনে নিজেরা খায় তাতেও গুনাহগার হবে না।

কুরবানীর চামড়া

১. কুরবানীর চামড়া বিক্রি না করে পরিশোধন করে নিজে ব্যবহার করা যায়। কুরবানীর চামড়া কুরবানী দাতার জন্য বিক্রি না করা উত্তম। এতদসত্ত্বেও কেউ

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

বিক্রি করলে বিক্রয় মূল্য সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয তারাই এর উপযুক্ত পাত্র। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয নেই তাদেরকে কুরবানীর চামড়ার মূল্য দেওয়াও জায়িয নেই। (হিদায়া:৪/৪৫০)

২. কুরবানীর চামড়ার ব্যাপারে উত্তম পন্থা হল: তা গরীব আত্মীয়-স্বজন বা দীনী শিক্ষায় অধ্যয়নরত গরীব ও এতীম ছাত্রদেরকে সরাসরি দান করে দেয়া। তালিবে ইলমদের দান করলে একদিকে যেমন দান করার সওয়াব পাওয়া যায়, অপরদিকে ইলমে দীন চর্চার মহান কাজে সহযোগিতাও করা হয় এবং এতে সদকায়ে জারিয়ারও সওয়াব পাওয়া যায়। কুরবানীর চামড়া কোন দীনী প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্রদের দান করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রি করানো উত্তম। কেননা এতে অধিক মূল্য অর্জিত হয়ে গরীবের বেশী উপকার হয় এবং দাতার সওয়াবও বেশী হয়। (জাওয়াহিরুল ফিকহ:১/৪৫৬)

৩. কুরবানীর গোশত বা অন্য অংশের বিনিময়ে, অনুরূপভাবে চামড়া বা চামড়া বিক্রিত টাকা দ্বারা যবাই করানো বা গোশত কাটানোর পারিশ্রমিক দেয়া জায়িয নেই। দিলে তার উপযুক্ত মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। (শামী:৬/৩২০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭)

যদি কোন কারণে কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করা সম্ভব না হয় তাহলে কুরবানীর পশুর মূল্য গরীবদের মাঝে সদকা করে দেওয়া জরুরী। (শামী-৬/৩২০)

৪. কুরবানীর গোশত, চামড়া বা চামড়ার মূল্য ইমাম, মুআযযিন, মাদরাসার শিক্ষক বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া যাবে না। তেমনিভাবে মসজিদ মাদরাসার নির্মাণ কাজেও লাগানো যাবে না। (শামী: ৬/৩২৮, ফাতহুল কাদীর:৮/৪৩৭)

ঈদের সুন্নাতসমূহ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল

দুই ঈদের রাত্রের ফযীলত

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে তার অন্তর সেই দিনও মৃত্যু বরণ করবে না যে দিন সকলের অন্তর মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাকবীরে তাশরীক

যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজরের ফরয নামাযের পর হতে ১৩ তারিখ আসরের ফরযের পর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সকল সাবালক পুরুষ, মহিলার যিম্মায় উক্ত তাকবীর একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা ওয়াজিব নয়। পুরুষগণ উচ্চস্বরে আর মহিলাগণ নিম্নস্বরে পড়বে। তাকবীরে তাশরীফ এই-

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

ঈদের সুন্নাতসমূহ

১. অন্য দিনের তুলনায় সকালে ঘুম থেকে উঠা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৫৯, বাইহাকী হাদীস নং-৬১২৬)

২. মিসওয়াক করা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)

৩. গোসল করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নাম্বার-১৩১৫)

৪. শরী'আত সম্মত সাজ-সজ্জা করা। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নাম্বার-৯৪৮)

৫. সামর্থ অনুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা। উল্লেখ্য, সুন্নাত আদায়ের জন্য নতুন পোষাক জরুরী নয়। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)

৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৮)

৭. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় জিনিস, যেমন খেজুর ইত্যাদি খাওয়া। তবে ঈদুল আযহাতে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং ঈদের নামাযের পর নিজের কুরবানীর গোশত দ্বারা আহার করা উত্তম।(সহীহ বুখারী হাদীস নং-৯৫৩, আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৮)

৮. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নাম্বার-১১৫৭)

৯. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৮)

১০. ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাত। বিনা উযরে মসজিদে আদায় করা উচিত নয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৫৬)

১১. যে রাস্তায় ঈদগাহে যাবে সম্ভব হলে ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা। (সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৮৬)

১২. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৯০)

১৩. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবীর বলতে থাকা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

(اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ)

তবে ঈদুল আযহাতে যাওয়ার সময় এই তাকবীর উচ্চস্বরে পড়তে থাকবে। (বাইহাকী হাদীস নং-৬১৩০)

ঈদের মুস্তাহাবসমূহ

১. সাধ্যানুযায়ী অধিক পরিমাণে দান খয়রাত করা। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৯)

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈদ মনে করে আনন্দ এবং খুশি প্রকাশ করা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)

৩. নিজ মহল্লার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করা। ফজরের নামায জামা'আতের সাথে সর্বদা আদায় করা অত্যন্ত জরুরী এবং ওয়াজিব। তবে দুই ঈদের ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করা অতি উত্তম। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯-২৯০)

ঈদের নামাযের তরীকা

প্রথমে কান বরাবর উভয় হাত তুলবে। তারপর এই ভাবে নিয়ত করবে যে "আমি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দুই রাকা'আত ওয়াজিব নামায এই ইমামের পিছনে পড়ছি।" অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত নাভির নিচে বাঁধবে এবং ছানা "সুবহানাকা..." পুরা পড়বে। তারপর আরো তিন বার তাকবীর বলবে। প্রথম দুইবার হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। এরপর তৃতীয় বার হাত কান পর্যন্ত তুলে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে চুপ করে ইমামের কিরাআত শ্রবণ করবে। এভাবে প্রথম রাকা'আত আদায়ের পর দ্বিতীয় রাকা'আতের কিরাআতের পর তিন বার হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে প্রত্যেকবার আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। এরপর চতুর্থ বার হাত না তুলে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায অন্যান্য নামাযের ন্যায় সম্পন্ন করবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/১৭২)

ঈদের মাসআলা-মাসাইল

১. মসজিদের বিছানা, চাটাই, শামিয়ানা ইত্যাদি ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া দুরুস্ত। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/৩৫৯)

২. যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডায় অথবা একমুষ্ঠির কম রেখে কর্তন করে তাকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। ঈদ এবং অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে একই হুকুম। ইমামতের বেলায় উত্তরাধিকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শরী'আতের দৃষ্টিতে ইমামতীর যোগ্য হওয়া জরুরী। (আদ্দুররুল মুখতার-২/৫৫৯)

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

৩. ঈদের নামাযের পূর্বে নিজ ঘরে বা ঈদগাহে ইশরাক ইত্যাদি নফল পড়া নিষিদ্ধ। ঈদের জামা'আতের পরেও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। হ্যাঁ, ঘরে ফিরে ইশরাক, চাশত নফল পড়তে কোন অসুবিধা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৯)

৪. ঈদের নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। ঈদের খুতবার পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব নয়। (মুসনাদে আহমদ হাদীস-২২১৮)

৫. শর'ঈ ওযর ব্যতীত ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা সুন্নাতের খেলাফ। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৯)

৬. যদি ইমাম অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ ভুল বশতঃ না বলে, আর ঈদের জামা'আত অনেক বড় হয়, তাহলে ফেতনা ফাসাদের আশংকায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করবে না। আর যদি এমন হয় যে উপস্থিত সকলেই সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/৯২)

৭. ঈদের দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকুর তাকবীর ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকুতে শরীক হয় তাহলে সে প্রথমে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। এরপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে শামিল হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৭৪)

৮. যদি কেউ প্রথম রাকা'আতে রুকুর পূর্বে জামা'আতে শরীক হয় এবং তাকবীরে তাহরীমার পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার সুযোগ না পায় তাহলে রুকুতে গিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। তবে সে ক্ষেত্রে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। (আদ্দররুল মুখতার-১/২৭৪)

৯. যদি প্রথম রাকা'আত ছুটে যায় তাহলে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে প্রথমে, সূরা, কিরাআত পড়বে। অতঃপর রুকুর পূর্বে তিন বার হাত তুলে তিন তাকবীর দিবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকু সিজদা করে যথা নিয়মে নামায সম্পন্ন করবে। (রুদ্দুল মুহতার-২/১৭৪)

১০. ঈদের ময়দানে জানাযার নামায পড়া জায়েয। প্রথম ঈদের নামায অতঃপর জানাযার নামায এরপর খুতবা হবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৬)

১১. বর্তমানে খতীব সাহেবগণ ঈদের খুতবার শুরুতে ও মাঝে মাঝে যে তাকবীরে তাশরীক বলে থাকেন নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হলো, প্রথম খুতবার শুরুতে নয় বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাত বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিম্বার

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থেকে নামার পূর্বে চৌদ্দ বার শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবে। এটাই মুস্তাহাব। খুতবার সময় বা খুতবার মাঝে তাকবীরে তাশরীক বলবে না। হ্যাঁ, ঈদের নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীক একবার বলবে। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৭৫)

১২. নামাযের পর ঈদের দুই খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। যদি খুতবা শোনা না যায়, তাহলে চুপচাপ বসে থাকবে। অনেক লোক সালামের পর খুতবা না শুনেই চলে যায়। যা সুন্নাতের খেলাফ। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৫৯)

১৩. খুতবার মধ্যে মুসল্লীদের কথা বার্তা বলা নিষেধ। এমন কি নবীজী ﷺ-এর নাম উচ্চারিত হলে মুখে দুরূদ পড়া নিষেধ। তবে অন্তরে পড়তে পারবে। তেমনিভাবে খুতবার মধ্যে দান বাক্স বা রুমাল চালানোও নিষেধ এবং গুনাহের কাজ। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১০১৪০, আদ্দররুল মুখতার-২/১৫৯)

১৪. উভয় খুতবা শেষ হলে ঈদের নামাযের সকল কাজ শেষ হল, এরপর ঈদের আর কোন কাজ বাকী নাই। সুতরাং খুতবা শেষ হলে সকলেই নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। বর্তমানে দেখা যায় যে ঈদের খুতবার পরে লম্বা মুনাজাত হয়। এটা মুস্তাহাব নয়। তারপর লোকদের মধ্যে মু'আনাকা বা কোলাকুলীর ভীড় লেগে যায় অথচ ঈদের সুন্নাতের মধ্যে কোলাকুলী করার কথা নাই। সুতরাং এটা ঈদের সুন্নাত মনে করা ভুল। বরং এটা দেখা-সাক্ষাতের সুন্নাত। কোন ভাইয়ের সাথে অনেক দিন পরে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম বিনিময় করবে। তারপর মুসাফাহা করবে। তারপর কোলাকুলী করবে। সুতরাং ঈদের নামাযের পূর্বে সাক্ষাত হলে তখনই এটা সেরে ফেলবে। আর যদি ঈদের খুতবার পর এরূপ কারোর সাথে সাক্ষাত হয় তাহলে কোলাকুলী করবে। এরূপ করবে না যে, সাক্ষাত হলো নামাযের পূর্বে কিন্তু কোলাকুলী করা হলো খুতবার পরে।(ফাতাওয়ায়ে শামী-৬/৩৮১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৫৪, সিলসিলাতুল আদাবিল ইসলামিয়াহ (মাকতাবায়ে শামেলা থেকে)

ঈদের নামায সম্পর্কিত আরো জরুরী দুটি মাসআলা

১. যদি কেউ ঈদের নামাযের প্রথম রাকা'আতে রুকুর পূর্ব মুহূর্তে ইমামের সাথে শরীক হয় তাহলে যদি তার ধারনানুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা পড়ার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বললেও রুকু পাওয়ার আশা থাকে তাহলে নিয়মানুযায়ী অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে রুকু করবে। আর যদি অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বললে রুকু পাবে না বলে ধারনা হয় তাহলে রুকুতে গিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। যদি প্রথম রাকা'আতই না পায় তাহলে ইমাম সাহেবের সালাম

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ফিরানোর পর ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে সানা পড়ার পর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর বলবে। (আদ্দুররুল মুখতার:১/১৫০, আল বাহরুর রায়িক:২/২৮২)

২. বর্তমানে ঈদের খুতবার শুরুতে ও মাঝে মাঝে খতীব সাহেবগণ যে তাকবীরে তাশরীক বলে থাকেন; নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হল: প্রথম খুতবার শুরুতে ৯ বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে ৭বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিম্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪বার শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবে। এবং এটাই মুস্তাহাব। খুতবার সময় তাকবীরে তাশরীক বলবে না। হ্যাঁ! ঈদের নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীক একবার বলবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৪/২৫২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/২৯০, বাইহাকী সুনানুল কুবরা-৩/৪২০, ফাতাওয়ায়ে শামী:২/১৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/১২৭)

নিজের আমলের হিসাব নেয়া

কুরআনে আছে, তোমার কিতাব অর্থাৎ তোমার আমলনামা তুমি পড়। ইক্বরা কিতাবাক। হাশরের ময়দানে আল্লাহ বলবেন, তোমার হিসাব তুমি করো, তুমি কিসের উপযুক্ত, জান্নাত না জাহান্নাম। আর হাদীসে আসছেঃ "তুমি নিজে নিজের হিসাব নাও আল্লাহর হিসাব নেয়ার আগে।" প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসার হিসাব রাখে। বছর শেষে সে হিসাব করে দেখে তার ব্যবসা ক্ষতির মধ্যে আছে না লাভের মধ্যে। যদি লাভের মধ্যে থাকে তাহলে আরো লাভ কিভাবে হয় তার ফিকির করে, অন্যদের সাথে পরামর্শ করে। আর যদি ক্ষতির মধ্যে থাকে তাহলে ক্ষতি থেকে বের হয়ে লাভবান কিভাবে হওয়া যায় তার ফিকির করে, অন্যদের সাথে পরামর্শ করে।

আমরা যারা যিলহজ্জ মাস পেলাম এর মানে আমাদের জীবন থেকে এক বছর শেষ হয়ে গেল। আমরা প্রত্যেকে দিলকে স্বাক্ষী রেখে আমাদের সারা বছরের আমলের হিসাব বের করি। পাঁচ জিনিসের নাম দীন। ঈমান সহী শুদ্ধ করা এবং রাখা, ইবাদত সুন্নত তরীকায় করা, রিযিককে হালাল করা, মা-বাবার হক সহ বান্দার হক আদায় করা, আত্মশুদ্ধি তথা নিজের দিলকে পাক করার মেহনত করা।

ঈমানঃ

হিসাব করা গত বছরের তুলনায় আমার ঈমান বাড়লো না কমলো, তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা বাড়লো না কমলো, তাকদীরের উপর একীন বাড়লো না কমলো ইত্যাদি।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ইবাদতঃ

আমার নামায আগের থেকে সুন্দর হলো কিনা, কুরআন তিলাওয়াত আগের থেকে সহী শুদ্ধ হলো কিনা ইত্যাদি।

রিযিক হালাল করাঃ

আমার কামাই রোযগারের ব্যাপারে আমি আগের থেকে বেশী সচেতন কিনা, আমি কতটুকু যাঁচাই-বাঁছাই করে কামাই রোযগার করছি তার হিসাব নেয়া। খাতায় লিখে লিখে করা।

বান্দার হকঃ

আমি বান্দার হকের ব্যাপারে গত বছরের তুলনায় কতটুকু সচেতন হয়েছি। আগের থেকে বেশী না কম, হিসাব নেয়া।

আত্মশুদ্ধিঃ

দশটা গুন আমার হাসিল হলো কিনা। আমার সবর-শোকর কতটুকু বেড়েছে। আবার আমার দিলের যে দশটা রোগ তা কমেছে কিনা। তাকাব্বুর দূর করা, কূ-দৃষ্টি দূর করা, অন্যের মেয়েকে বা বিবিকে দেখা, গুনাহ বর্জন করছি কতটুকু, নাচ-গান করা বা দেখা বন্ধ করেছি কিনা। এক হাদীসে এসেছে, এই উম্মতের এক দল সারা রাত নাচ-গান করবে তারপর সকালে উঠে দেখবে কেউ শুকর, কেউ বানর হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কথা কখনো মিথ্যা হয় না। যেহেতু হাদীসে এসেছে সুতরাং তা হবে। তাই সকলের সাবধান হওয়া চাই এবং অন্যকে সাবধান করতে হবে।

দাওয়াতঃ

আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের উপর নবীওয়ালা যে যিম্মাদারী তার কতোটুকু হক আমি আদায় করেছি। কতোটুকু সময় আমি খালেস আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য দিয়েছি তার হিসেব করা।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে যিলহজ্জ মাসের সকল আমল যার যা সাধ্য অনুযায়ী করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store